তাওহীদের ডাক

৫২তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২১
Web : www.tawheederdak.com

- ইসলামের প্রথম সমাচার
- মনুষ্যত্বের ছিন্ন মস্তক
- বরকত ও মুমিন জীবনে এর প্রভাব
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা)
- গ্রন্থ পর্যালোচনা : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)
- রোহিঙ্গাদের পর মিয়ানমার : সামরিক জান্তার কবলে এবার কারা?

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

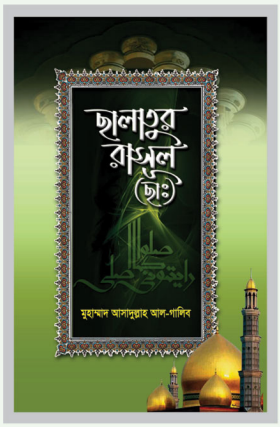

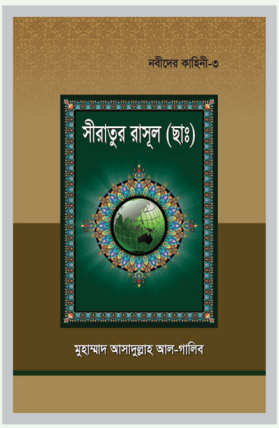

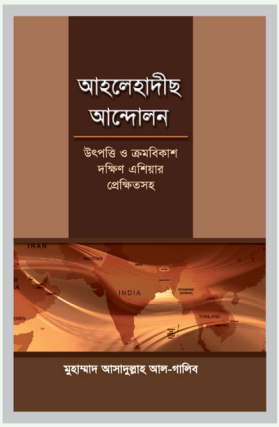

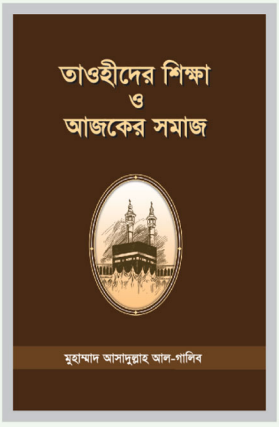

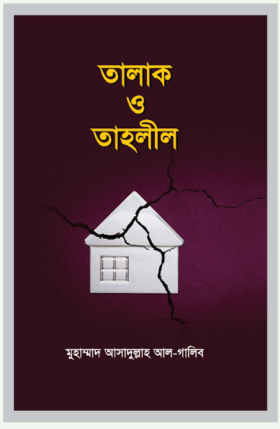

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, Email : tahreek@ymail.com, ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৫২ তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০২১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫-২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
- চাই সহনশীলতার চর্চা ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪

তাবলীগ
- **পরহেযগারিতা** (শেষ কিস্তি) ৭
  মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

তারবিয়াত
- **বারাকাহ : মুমিন জীবনে এর প্রভাব** ১০
  ড. মুখতারুল ইসলাম

তাজদীদে মিল্লাত
- **ইসমাঈলী শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস** (শেষ কিস্তি) ১৭
  ড. মুখতারুল ইসলাম

সাময়িক প্রসঙ্গ
- **রোহিঙ্গাদের পর মিয়ানমার সামরিক জান্তার কবলে এবার কারা?** -শামসুল আলম ২১

সাক্ষাৎকার
- মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ২৬

স্মৃতিচারণ
- শেখ আব্দুছ ছামাদ ৩২

অর্থনীতি
- **বাজেট সমাচার** ৩৪
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

ধর্ম ও সমাজ
- **মনুষ্যত্বের ছিন্ন মস্তক** ৩৭
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

প্রবন্ধ
- **ইসলামের প্রথম সমাচার** ৪০
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয

গ্রন্থ পর্যালোচনা
- **সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)** ৪৩
  ইরফানুল ইসলাম
- **পরশ পাথর** ৪৬

শিক্ষাঙ্গন
- **দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা** ৪৭
  লিলবর আল-বারাদী
- **অনুবাদ গল্প** ৫১
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫২
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫

সম্পাদকীয়

চাই সহনশীলতার চর্চা

মতভেদ এমন একটি বিষয়, যা মানবজাতির সৃষ্টিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। নানা মুনির নানা মত- প্রবাদটির মত আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে মতপার্থক্য এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই নানান মতের রহস্য ও পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন- 'আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে এক দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে রেখ) আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে' *(মায়েদা ৫/৪৮)*। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আপনার রব চাইলে সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে তারা নয়, যাদের প্রতি আপনার রব অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন' *(হূদ ১১/১১৮-১৯)*। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি, চর্চা-অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য ঘটে। নিত্য-নতুন ভাবের উদয় হয়। সুতরাং মানবসমাজে মতভেদ থাকবেই। বরং মতের এই বিভিন্নতা আল্লাহ্র অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। নইলে মানবজীবনধারা আমাদের চোখে এতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ধরা দিত না।

মতভেদ ও মতপার্থক্যের এই স্বভাবজাত বিষয়টি যখন আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তখন লক্ষ্য করি আমাদের একটি বড় অংশই এ ব্যাপারে যথেষ্ট অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। একদল মনে করেন মতপার্থক্যই ইসলামের সৌন্দর্য। সুতরাং যত মত তত পথ। যে যে পথেই চলুক না কেন, শেষ ঠিকানা আরাধ্য সত্তার সান্নিধ্য। আর অপর দল মনে করেন, ইসলামে কোন প্রকার মতপার্থক্যের স্থান নেই। সুতরাং ভিন্নমত মানেই ভ্রষ্টতার পথ, বিভ্রান্তির পথ। অথচ সত্য লুকিয়ে আছে এতদুভয়ের মধ্যখানে।

মতভেদের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান হ'ল- **প্রথমতঃ** কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মতভেদের নিষ্পত্তি করতে হবে। আল্লাহ বলেন- 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, সে বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূল (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*। **দ্বিতীয়তঃ** মতভেদ করে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। **তৃতীয়তঃ** কোন বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান বা দলীল পাওয়া গেলে সে বিষয়ে মতভেদ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

চতুর্থতঃ কোন বিষয়ে স্পষ্ট দলীল না পেলে যদি মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তবে তার স্বীকৃতি দিতে ইসলাম নিষেধ করেনি। যেমন ইজতিহাদী মাসআলাগত বিষয়। কেননা মানুষ অসীম জ্ঞানের অধিকারী নয়। তাই তার অজ্ঞতা ও স্বল্পজ্ঞান থেকে জন্ম নিতে পারে ভিন্নমত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে এবং সঠিক মতে উপনীত হয়, তখন তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি সে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার (কেননা সে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে) *(বুখারী হা/৭৩৫২; মিশকাত হা/৩৭৩২)*। অনুরূপভাবে বনু কুরায়যায় আছরের ছালাত আদায় সম্পর্কে ছাহাবীদের মতভেদ থেকেও বুঝা যায় যে, সব মতভেদ বাতিলযোগ্য নয় *(বুখারী হা/৯৪৬; মুসলিম হা/১৭৭০)*। সুতরাং অসঙ্গত মতপার্থক্য যেমন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়; আবার মতপার্থক্য মানেই যে নিন্দনীয়, তা নয়।

বর্তমান যুগে সচরাচর যে চিত্রটি আমাদের খুব পরিচিত তা হ'ল, ছোটখাটো বিষয়েও মতপার্থক্য দেখা দিলে আলেম সমাজ ও ধর্মীয় মহলে দেখা দেয় পারস্পরিক দূরত্ব এবং কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির প্রতিযোগিতা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তো বিষয়টি প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অনেক সময় এই বাকযুদ্ধ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে মনে হয় কেবল খুনোখুনিটা বাকি। এর পিছনে মূল যে কারণটি নিহিত, তা হ'ল- মতপার্থক্যের প্রকৃতি না বুঝা এবং কোন মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে মতবিরোধের হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করা। অথচ অন্তরে ইখলাছ ও তাক্বওয়ার যথাযথ চর্চা থাকলে এবং কিছু মূলনীতি মনে রাখলে এধরনের মতবিরোধ সহজেই এড়ানো যেত। নিম্নে আমরা কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করতে চাই, যেগুলো আমাদের মধ্যকার এই অনৈক্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন :

(১) সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। এদু'টি মতভেদ দূরীকরণে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। আমাদের মনে রাখা ভাল যে, ভিন্নমত মানেই ভুল মত নয়। বরং বাহ্যদৃষ্টিতে কোন সময় একটি মতকে সঠিক মনে হলেও এমনও হ'তে পারে যে, ভিন্ন মতই সঠিক। মুসা (আঃ) ও খিযির (আঃ)-এর ঘটনা এক্ষেত্রে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় *(কাহফ ৬০-৮২)*।

(২) সর্বদা পরামর্শ ও আলোচনার দুয়ার খোলা রাখা। যে কোন সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠার সাথে আলোচনা করা। যদি সদিচ্ছা নিয়ে পর্যালোচনার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়, তবে যে কোন জটিল বিষয়ের সমাধানও সহজ হয়ে যায়। এজন্য সর্বোত্তম পন্থায় আলোচনা-পর্যালোচনার পথ খোলা রাখতে হবে *(আলে ইমরান ৩/১৫৯; নাহল ১৬/১২৫)*। আল্লাহ বলেন, 'আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে- যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য উস্কানী দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৫৩)*।

(৩) অধিকতর শক্তিশালী দলীলকে প্রাধান্য দেয়া। শরী'আতের কোন বিষয়ে উভয় মতের স্বপক্ষে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য দলীল উপস্থিত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মতটিকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন, 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৮)*।

(৪) ব্যক্তিস্বার্থ বা কারো প্রতি বিদ্বেষভাব দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। আমাদের সমাজে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা তাড়িত হওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। সমাজে অধিকাংশ মতভেদ বিষাক্ত আকার ধারণ করে মূলতঃ স্বার্থপরদের কারণে, যারা যে কোন মূল্যে ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করতে চায়। যে কোন মতবিরোধ নিরসনের পূর্বশর্ত হ'ল এই মহা ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা *(নিসা ৪/১৩৫; মায়েদা ৫/৮; শূরা ৪২/৪০)*।

(৫) বৃহত্তর ও সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক সময় ক্ষুদ্রতর বিষয়গুলো ত্যাগ করা বা এড়িয়ে যাওয়া দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ খারেজী যুল-খুয়াইছিরার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আচরণ এই দূরদর্শিতারই সাক্ষ্য দেয়। রাসূল (ছাঃ) চাইলে তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি বলেন, 'তাকে ছেড়ে দাও, ভবিষ্যতে কেউ যেন না বলতে পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করেন' *(বুখারী হা/৪৯০৫)*। হোদায়বিয়ার সন্ধি কিংবা মক্কা বিজয়কালে রাসূল (ছাঃ)-এর ভূমিকা এই মূলনীতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

(৬) আত্ম-অহংকারে লিপ্ত না হওয়া। অনেক সময় জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিরাও নিজেদের অহংবোধ ধরে রাখতে গিয়ে স্বীয় মতের বাইরে ভিন্ন কোন মতকে সামান্য অবকাশও দিতে চান না। বরং অন্যায় যিদ ও হঠকারিতার মধ্যে ডুবে যান। অথচ দ্বীনের স্বার্থে অন্যের জ্ঞানকেও স্বীকৃতি দেয়ার উদারতা রাখতে পারলে বহু মতভেদপূর্ণ বিষয় সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়। মনে রাখা ভাল যে, নিজের বিজ্ঞতাকে সর্বেসবা ভাবার চেয়ে বড় অজ্ঞতা আর নেই। আল্লাহর বাণী আমাদের জন্য অনেক বড় নছীহত- 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর অধিক জ্ঞানী আছে' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*।

(৭) সর্বদা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি রুজু থাকা। কেননা এই দু'জন ব্যতীত পৃথিবীর কারো বক্তব্যই শতভাগ গ্রহণীয় নয়। ব্যক্তি যত জ্ঞানী ও যত বড় ইমামই হোন না কেন, তার কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার বিপরীত হ'লে তা সর্বতোভাবে বর্জনীয় *(আন'আম ৬/১৫৩; আ'রাফ ৭/৩; নূর ২৪/৫১)*।

(৮) আত্মসংশোধনকে হীনতা মনে না করা। কারণ সংশোধন হ'তে পারাই ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যত নেককার ব্যক্তিই হোক, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয় *(ইউসুফ ১২/৫৩; নাজম ৫৩/৩২)*। সুতরাং ভুলের উপর টিকে থাকায় কোন কৃতিত্ব নেই; বরং আত্মসংশোধনেই রয়েছে সফলতা। আল্লাহ বলেন, 'যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না *(আ'রাফ ৭/৩৫)*।

(৯) অপরের কল্যাণকামী হওয়া। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা যার মনে বিরাজ করে, মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া তার জন্য প্রায় অসম্ভবই। বরং সংশোধন ও সংস্কারের প্রবল আকুতি উল্টো তাকে মতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাড়িত করে। তার ভাবনা জুড়ে প্রতিধ্বনিত থাকে আল্লাহর বাণী- মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ'তে পার *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। এমনকি অমুসলিমের প্রতিও সে থাকে দয়ার্দ্রচিত্ত *(মুমতাহিনা ৮)*। মানুষকে ক্ষমা করা, ছাড় দেয়া, সহমর্মিতা প্রকাশ করা ইত্যাদি হয় তার নিত্য বৈশিষ্ট্য *(আলে-ইমরান ৩/১৩৪; নূর ২৪/২২)*। কোন অবস্থাতেই সে অন্যের সম্মানহানির চিন্তা করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে *(মুসলিম হা/২৫৬৪)*। তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন হ'ল কল্যাণকামিতার নাম' *(মুসলিম হা/৫৫)*।

(১০) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : একজন মুসলমানের জীবন হবে ভারসাম্যপূর্ণ। অতি অনুরাগ কিংবা অতি বিরাগ তাকে কখনই বিভ্রান্ত বা লক্ষ্যচ্যুত করবে না। কোন অবস্থাতেই সে চরমপন্থা অবলম্বন করবে না। বাড়াবাড়ি করবে না। বরং সাধ্যমত মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সমঝোতার পথ খোলা রাখবে *(বাক্বারাহ ২/১৪৩; ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করা, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিও না *(বুখারী হা/৬৯; মুসলিম হা/১৭৩২)*।

প্রিয় পাঠক! বর্তমান যুগে আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের দাওয়াতের ময়দান যেমন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি এর বিপরীতে আলেম-ওলামা ও ধর্মীয় দল-উপদলের মধ্যে বাড়ছে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ-বিবাদ। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ধার্মিক তরুণদের একটা বড় অংশ একে অপরের বিরুদ্ধে জবাব-পাল্টা জবাব, রদ-পাল্টা রদে মহা ব্যস্ত। কারো বিরুদ্ধে সামান্য ত্রুটি পাওয়া মাত্রই তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগা, সম্মানহানি করা এগুলো এখন স্বাভাবিক কালচারে পরিণত হয়েছে। কোন বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান কিংবা প্রকৃত তথ্য না জানা থাকলেও তারা বড় বড় মন্তব্য, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্রোক্তি করতে দ্বিধা করছে না। ফলে মতভেদের বিষবাষ্প বাড়ছে বৈ কমছে না।

অথচ এই মতভেদ-ঝগড়া, বিবাদ-বিসংবাদ, গীবত-তোহমত কখনই ইসলামের কাম্য নয়। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের দ্বীনদারিতার, হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইখলাছ, বিনষ্ট হচ্ছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ, বিপথগামী হচ্ছে আমাদের সমাজ; সর্বোপরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অগ্রযাত্রা। আল্লাহ বলেন, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না। করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন *(আনফাল ৮/৪৬)*। সুতরাং যদি আমরা আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্যশীল বান্দা হ'তে চাই, আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে ইসলামী সংস্কৃতির সুসভ্য বাতাবরণে সাজাতে চাই, ঐক্য ও সংহতির সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই এবং মুসলিম উম্মাহকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে দেখতে চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই মতবিরোধের এই অশুভ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধৈর্য, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। পারস্পরিক সমঝোতার পথ খুঁজে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। তুচ্ছ কারণে আমাদের মধ্যে শয়তান যেন কোনরূপ বিভেদের দরজা খুলতে না পারে, সে ব্যাপারে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। আর এর মাঝেই নিহিত রয়েছে আমাদের দুনিয়াবী ও পরকালীন সাফল্য ও মর্যাদা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

ক্বিয়ামত

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ-

(১) 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন অতীব ভয়ংকর বিষয়। যেদিন তোমরা দেখবে দুগ্ধদায়িনী মা তার স্তন্যপায়ী সন্তানকে ভুলে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভ খালাস হয়ে যাবে। আর তোমরা মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠিন' *(হজ্জ ২২/১-২)*।

২- يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ -

(২) 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন উপকার করতে পারবে না বা পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য' *(লোকমান ৩১/৩৩)*।

৩- وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا - اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا-

(৩) 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

৪- يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

(৪) সেদিন আমরা আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমাদের ওয়াদা সুনিশ্চিত। আমরা তা পালন করবই যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে *(আম্বিয়া ২১/১০৪, ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

৫- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ-

(৫) 'যেদিন প্রত্যেকে উপস্থিত (ফলাফল) পাবে যা কিছু সৎকর্ম সে করেছিল এবং যা কিছু মন্দকর্ম সে করেছিল। সে চাইবে যদি তার ও তার মন্দ কর্মের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান সৃষ্টি হ'ত! বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল' *(আলে ইমরান ৩/৩০)*।

৬- إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ- وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ- وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ- وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ - لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ- لِيَوْمِ الْفَصْلِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-

(৬) 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দেওয়া (ক্বিয়ামতের) ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। যেদিন নক্ষত্ররাজি নির্বাপিত হবে। আকাশ ছিদ্রান্বিত হবে। পর্বতমালা উড়ে যাবে। যেদিন রাসূলগণের (স্ব স্ব উম্মতের সাথে চূড়ান্ত ফায়ছালার জন্য) একত্রিত হওয়ার সময় নির্ধারিত হবে। এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্য বিলম্বিত করা হচ্ছে? বিচার দিবসের জন্য। তুমি কি জানো বিচার দিবস কি? সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য' *(আল-মুরসালাত/৭৭-১৫)*।

৭- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا - فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا- لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا - يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا -

(৭) তারা তোমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) পাহাড় সমূহের অবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও যে, আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে (ধূলির মত) উড়িয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করবেন। যেখানে তুমি কোনরূপ বক্রতা বা

উচ্চতা (অর্থাৎ উঁচু-নীচু) দেখতে পারে না। সেদিন তারা একজন আহ্বানকারীর (ইস্রাফীলের ফুঁকের) অনুসরণ করবে। যার অনুসরণ থেকে ডাইনে-বামে যাবার উপায় থাকবে না। দয়াময়ের সামনে সেদিন সকল শব্দ নিশ্চুপ হয়ে যাবে কেবল মৃদু পদশব্দ ছাড়া *(ত্বাহা ২০/১০৫-১০৮)*।

٨- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ- وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ-

(৮) 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে, তবে যাকে আল্লাহ

ইচ্ছা করেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে এবং (বান্দার) আমলনামা পেশ করা হবে। (প্রত্যেক উম্মতের) নবীদের ও সাক্ষ্যদাতাদের (ফেরেশতাদের) আনা হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে সঠিক ফায়ছালা করা হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা' *(আয-যুমার ৩৯/৬৮-৬৯)*।

٩- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ- قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ- فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-

(৯) 'আর যখন শিঙ্গায় ফুঁকে দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ তো সত্য কথাই বলেছিলেন। এটা তো হবে কেবল একটি মহা নিনাদ। অতঃপর তখনই সবাইকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। আজ কারু প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না এবং তোমরা (দুনিয়ায়) যা করতে কেবল তারই প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে। অনুবাদ বাকি আছে' *(ইয়াছিন ৩৬/৫১-৫৪)*।

হাদীছে নববী :

١٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ-

(১০) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) বলেন, পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন প্রভুর নিকট থেকে আদম সন্তানের পা সরবে না। জিজ্ঞাসা করা হবে তার বয়স সম্পর্কে, কি কাজে সে তা অতিবাহিত করেছে, তার যৌবন সম্পর্কে কি কাজে সে তা বিনাশ করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা অর্জন করেছে আর কি কাজে সে তা ব্যয় করেছে এবং সে যা শিখেছিল তদনুযায়ী কি আমল সে করেছে?[১]

١١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ، الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ-

(১১) 'আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে খালি পায়ে, খালি দেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নারী-পুরুষ সকলে কি একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে থাকবে না? তিনি (ছাঃ) বললেন, হে 'আয়েশা! সে সময়টি

১. *সিলসিলা ছহীহাহা/৯৪৬; তা'লীকুর রাগীব ১/৭ পৃঃ, রওযুন নাযীর হা/৬৪৮; তিরমিযী হা/২৪১৭; মিশকাত হা/৫১৯৭।*

এত ভয়ঙ্কর হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ পাবে না’।[২]

١٢- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطْوِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِى الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ -

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা আকাশ সমূহকে ভাঁজ করে ফেলবেন। অতঃপর তা ডান হাতে ধারণ করবেন আর বলবেন, আমি আজ বাদশা। কোথায় আজ স্বৈরাচারীরা? কোথায় আজ অহংকারীরা? এর পর পৃথিবীগুলোকে বাম হাতে ভাঁজ করে ধরবেন। অতঃপর বলবেন, কোথায় আজ স্বৈরাচারীরা? কোথায় আজ অহংকারীরা?[৩]

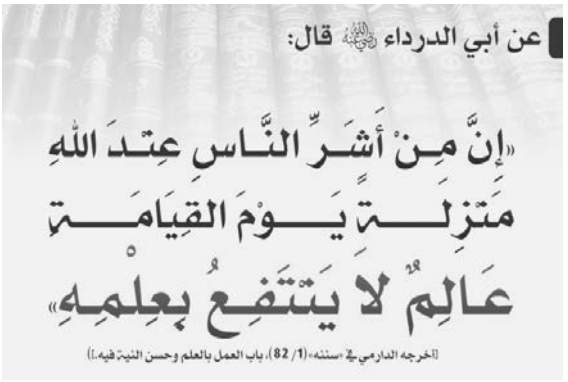

١٣- أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِى أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

(১৩) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফিরদের কীভাবে চেহারার উপর উপুড় করে উঠানো হবে? তিনি বললেন, যে মহান সত্ত্বা দুনিয়াতে দু’পা দিয়ে চলাচল করিয়েছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখ-মন্ডল দিয়ে চলাচল করাতে পারবেন না? কাতাদা বললেন, অবশ্যই তিনি পারবেন, মহান রবের সম্মানের কসম করে বলছি’।[৪]

١٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ-

(১৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মানুষ ঘর্মাক্ত হবে। এমনকি যমীনের সত্তর হাত ঘামে ডুবে যাবে। তাদের ঘামে তারা কান পর্যন্ত ডুবে যাবে’।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের মাঠে নিজের ব্যাপারে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হ’ল, যখন আমাকে প্রশ্ন করা হবে হে আবুদ্দারদা! তুমি যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছিল সে অনুযায়ী কিভাবে ও কতটুকু আমল করেছ?[৬]

২. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস অভিশপ্ত। কেননা এর ছোট-বড় প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক পরিচালিত হয়। দুনিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা তাড়া করতে গিয়ে ফেরআউনকে মহান আল্লাহ তার শাস্তি স্বরূপ সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ধন-সম্পদলোভী কৃপণ কারূণকে আল্লাহ মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা কারূণ আল্লাহ্‌র নবী মুসা (আঃ) -কে অনেক কষ্ট দিয়েছিল’।[৭]

সারবস্তু :

১. পার্থিব জীবনের পর এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন হ’ল মহাবিচারের দিবস। সেই ভয়াবহ দিনে মহান আল্লাহর নিকট সকলকে দাঁড়াতে হবে এবং নিজেদের হিসাব দিতে হবে।

২. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। আর এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে তার জন্য জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।

৩. কিয়ামতের দিন কাফেরকে মুখের উপর ভর করে উপুড় করে হাটানো হবে, যেভাবে সে এখন দুনিয়ায় দু’পায়ের ভরে চলে।

৪. ক্বিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ দিবস। সকলে ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করতে থাকবে। নিজের ব্যতীত পাশের জনের খবর কেউ নিবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসন্ন মন্দ পরিণতির আশংকা নিয়ে মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে।

৫. বিচক্ষণ মুমিন হ’ল সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা ক্বিয়ামতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

---

২. বুখারী হা/৩৪৪৭; মুসলিম হা/২৮৫৯; তিরমিযী হা/২৪২৩; মিশকাত হা/৫৫৩৬।
৩. মুসলিম হা/২৭৮৮; মিশকাত হা/৫৫২৩।
৪. বুখারী হা/৪৭৬০।
৫. বুখারি হা/৬৫৩২।
৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৬০৩৮।
৭. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৮/৬২৫।

পরহেযগারিতা

- মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

(শেষ কিস্তি)

গ্রহণযোগ্য দ্বীনদারী :

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْوَرَعُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الْوَرَعُ عَمَّا قَدْ تُخَافُ عَاقِبَتُهُ وَهُوَمَا يُعْلَمُ تَحْرِيْمُهُ وَمَا يَشُكُّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِهِ 'শরী'আত সম্মত দ্বীনদারী হ'ল, যেসব কাজের পরিণতি আশঙ্কাজনক তা থেকে বিরত থাকা। আর আশঙ্কাজনক কাজগুলো হ'ল, যে কাজ হারাম হওয়ার বিষয়ে জানা গেছে অথবা যে কাজ হালাল কি হারাম সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এছাড়া যেসব কাজ করা থেকে ছেড়ে দেয়াতে তেমন কোন ক্ষতি নেই, সেগুলোও আশঙ্কাজনক কাজ'।[১] পূর্বে আমরা এ ধরনের তাক্বওয়া বা দ্বীনদারীর একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি।

অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারী ঃ এটি কয়েকটি ধাপে বিভক্ত। আর তা হল-

(ক) দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা :

কতিপয় লোক রয়েছে যারা দ্বীনদারী অবলম্বনে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এবং তারা ইসলামী শরী'আতের মূল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে আসে। এটি নিতান্তই বাড়াবাড়ি ও খারাপ কাজ। কেননা সবকিছুর একটি সীমা রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার সকল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে যায় এবং লক্ষচ্যুত হয়। সুতরাং কোন মানুষের জন্য দ্বীনদারী অবলম্বনে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে মানুষ যেসব বাড়াবাড়ি করে তার উদাহরণ। যেমন- যখন হারাম মাল হালালের সাথে মিশে, তখন হারাম মালকে হালাল থেকে আলাদা করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ১০০ দিনারের মালিক হয় তার অর্ধেক হালাল আর বাকী অর্ধেক হারাম। অর্থাৎ সে অর্ধেক সম্পদের দায় থেকে পরিত্রাণ পেল। কিন্তু এ ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলে যে, নির্ধারিত হারাম অর্ধেক থেকে দায়মুক্তি দ্বারা সে কোন উপকৃত হতে পারবে না। এটিই হ'ল, বাড়াবাড়ি, যা তাক্বওয়ার সীমা থেকে এক ধাপ আগে বাড়িয়ে বাড়তি তাক্বওয়া অবলম্বন করা হয়, যার কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই।

যখন হালাল মাল হারামের সাথে মিশে তার বিধান কি হবে? এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম তা থেকে গ্রহণ করাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু যদি হারামের পরিমাণ একেবারে সামান্য হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। এ বিষয়টি ইমাম আহমাদ (রহঃ) পরিস্কার করেছেন, يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَجَنَّبَهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا يَسِيْرًا أَوْ شَيْئًا لَا يَعْرِفُ 'এ ধরনের মাল থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু যদি তা সামান্য বস্তু হয় বা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু না হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নেই'।[২]

আবার কোন কোন সালাফ বা আলেম বলেন, যদি জানা যায় যে, তার মালের মধ্যে হারাম মাল রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে জানে না, কোনটুকু হালাল আর কোনটুকু হারাম; তাহ'লে তার জন্য তা হতে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, لَا بَأْسَ أَن يَؤْكُلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ 'এ ধরনের সম্পদ হতে খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে পারবে যে, নির্দিষ্ট এ সম্পদটি হারাম'।[৩]

আবার কোন কোন আলেম কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই এ ধরনের সম্পদ থেকে দ্বীনদারী অবলম্বন করার কথা বলেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَا يُعْجِبُنِيْ ذَلِكَ وَتَرْكُهُ أَعْجَبُ إِلَيَّ 'এ ধরনের সম্পদ ভক্ষণ করা আমার নিকট পসন্দনীয় নয়। আর ছেড়ে দেয়া আমার মতে অধিক প্রিয়'।[৪]

তবে যখন যে পরিমাণ হারাম মাল তার মধ্যে প্রবেশ করছে, তা বের করে দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট মালকে ব্যবহার বা কাজে লাগানো হয়, তখন তা হ'তে ভক্ষণ করা জায়েয।

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيْرًا أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَرَامِ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِيْ 'যদি অধিক সম্পদ থেকে কিছু হারাম সম্পদ বের করা হয়। তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই'।[৫]

এ অবস্থার মধ্যে নির্ধারিত হারাম মালকে বের করে আনার পর তা থেকে বেঁচে থাকা বা সে মালকে কোন প্রকার কাজে লাগানো উচিত নয়। কেউ যদি একে তাক্বওয়া মনে করে তবে সে ভুল করবে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ হয়। কিন্তু এ ধরনের সন্দেহের উপর ভিত্তি

---

১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৫১১-৫১২, সংক্ষেপিত।*

২. *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৭০ পৃঃ।*
৩. *প্রাগুক্ত।*
৪. *প্রাগুক্ত।*
৫. *প্রাগুক্ত।*

করে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা কোনক্রমেই উচিত নয়। যেমন তুমি কোন একজন মুসলিম ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলে যার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জান না। তারপর যখন তোমার সামনে সে খাবার উপস্থিত করল। তখন তুমি বলবে, তুমি যে টাকা দিয়ে বাজার করছ, সে টাকা কোথায় পেয়েছ? এ ধরনের জিজ্ঞাসা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

এ ধরনের প্রশ্ন কি তাক্বওয়া হতে পারে? এ ধরনের প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই তাক্বওয়ার মানদণ্ডে পড়ে না। বরং এ ধরনের প্রশ্নের মধ্যে একজন মুসলিমকে কষ্ট দেয়া ও তাকে লজ্জা দেয়া হয়। কেননা এ ধরনের প্রশ্ন করা হ'ল, তাকে অপবাদ দেয়া হয়। কোন মুসলিমকে কোন প্রকার দলীল প্রমাণ বা আলামত ব্যতীত অপবাদ দেয়া এবং তাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ। আর এ হ'ল, একজন মুসলিমের প্রতি খারাপ ধারণা করা এবং একজন মুসলিমের জন্য আর অপর মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

(খ) কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা :

এখানে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এগুলোকে তাক্বওয়া বলা চলে না; বরং এগুলোকে কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা বলা হয়। এ বিষয়ে উদাহরণ গিয়ে আল্লামা ইবনু হাজার (রহঃ) ফাৎহুল বারীতে উল্লেখ করেন, وَرَعِ الْمُوَسْوَسِينَ كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ كَانَ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ أَفْلَتَ مِنْهُ ، وَكَمَنْ يَتْرُكُ شِرَاءَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَجْهُولٍ لَا يَدْرِي أَمَالُهُ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ وَلَيْسَتْ هُنَاكَ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى الثَّانِي ، 'কোন কোন লোক এমন রয়েছে তারা শিকার করা পাখি খায় না। তারা আশঙ্কা করে, শিকারটি কোন মানুষের ছিল। তারপর সে তার মালিকের নিকট থেকে পালিয়ে গেছে। তাই সে চিন্তা করে, মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা হতে খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় বস্তু কোন অপরিচিত লোক থেকে ক্রয় করে তা খায় না। তার যুক্তি হল, তা কি হালাল না হারাম তা সে জানে না। অথচ এখানে এমন কোন প্রমাণ নেই বা একথা প্রমাণ করে যে, বস্তুটি হারাম। কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ শরী'আতের মূলনীতি হ'ল, প্রতিটি বস্তুর আসল প্রকৃতি হ'ল হালাল হওয়া, যদি হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। আর যদি হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে হারাম বলা যাবে। অন্যথায় তাকে হারাম বলাও হারাম'।[৬]

ওয়াসওয়াসার আরেকটি দৃষ্টান্ত :

আল্লামা যিরাকশী (রহঃ) বলেন, لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ غَزْلَ زَوْجَتِهِ فَبَاعَتْ غَزْلَهَا وَوَهَبَتْ الثَّمَنَ لَمْ يَكْرَهْ أَكْلُهُ فَإِنَّ تَرْكَهُ فَلَيْسَ بِوَرَعٍ بَلْ وَسْوَاسٌ 'যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে, সে তার স্ত্রীর কাপড় পরিধান করবে না। এরপর স্ত্রী তার কাপড়টি বিক্রি করে দিল এবং বিক্রয় মূল্যটি তার স্বামীকে দান করল, তখন তার জন্য তা খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, তার কাপড় ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়া কোন দ্বীনদারীর অংশ নয়, বরং তা হ'ল ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা'।[৭]

বিশেষ পরহেযগারিতা :

কিছু কিছু বিষয়ে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী রয়েছে, যেগুলো শুধু বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সবার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ এ ধরনের পরহেযগারিতাকে খাছ পরহেযগারিতা বলা হয়। আল্লামা ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, وَهَاهُنَا أَمْرٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ وَهُوَ أَنَّ التَّدْقِيْقَ فِي التَّوَقُّفِ عَنِ الشُّبُهَاتِ إِنَّمَا يُصْلِحُ لِمَنْ اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُ كُلُّهَا وَتَشَابَهَتْ أَعْمَالُهُ فِي التَّقْوَى وَالْوَرَعِ فَأَمَّا مَنْ يَقَعُ فِي انْتِهَاكِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يَتَوَرَّعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَقَائِقِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ 'এখানে একটি বিষয় রয়েছে, যে বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত যরূরী। আর তা হ'ল, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বিরত থাকা তার জন্য মানায়, যার সকল অবস্থা স্থির এবং তার আমলসমূহ তাক্বওয়া বা দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে হারামে লিপ্ত হয়, তারপর সে সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে দ্বীনদারী অবলম্বন করে; তার জন্য এ ধরনের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা মানায় না। তার ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বীনদারী বা পরহেযগারিতা কোন ক্রমেই প্রযোজ্য নয়। বরং তাকে এ ধরনের পরহেযগারিতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়'।[৮] যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে ইরাকের এক অধিবাসী ব্যাঙের পেশাবের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, তারা আমাকে ব্যাঙের পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا 'দুনিয়াতে তারা উভয়ে আমার দুই বাহু'।[৯]

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, يَشْتَرِيْ بَقْلًا وَيَشْتَرِطُ الْخَوْصَةَ يَعْنِي الَّتِي تُرْبَطُ بِهَا

৬. *ফাৎহুল বারী ৪/২৯৫ পৃঃ।*

৭. *আল-মানছুর ফিল ক্বাওয়ায়েদ ২/২৩০ পৃঃ।*
৮. *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১১১ পৃঃ।*
৯. *বুখারী হা/৫৯৯৪; জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১১১ পৃঃ।*

www.tawheederdak.com

حَزَمَةَ الْبَقْلِ فَقَالَ أَحْمَدُ إِيْشَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ؟! قِيْلَ لَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ نُعَيْمٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ إِنَّ كَانَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ نُعَيْمٍ فَنَعَمْ هَذَا يَشْبَهُ ذَاكَ ‘সে সবজি কেনার সময় শর্ত দিয়ে বলল, আমি তোমার থেকে সবজি এ শর্তে ক্রয় করতে পারি, যদি তুমি আমাকে একটি দড়ি দাও যার দ্বারা আমি আমার সবজিগুলো বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার কথা শুনে বলল, এ ধরনের কাজ কে করে? তখন তাকে জানানো হল, ইবরাহীম ইবনে আবু নু‘আইম এ ধরনের কাজ করে থাকে। তখন তিনি বললেন, যদি ইবরাহীম ইবনে আবু নু‘আইম এ ধরনের কাজ করে থাকে তবে তা বৈধ। কেননা, দড়িটি সবজির সাথে সম্পৃক্ত।[১০]

সারকথা : কিছু কিছু বিষয় রয়েছে এত সূক্ষ্ম, যা থেকে বেঁচে থাকা কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং যারা এসব থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তারা যদি ফাসেক বা সুযোগসন্ধানী লোক হয়, তাদেরকে তা হতে বিরত রাখতে হবে এবং তাদের প্রতিহত করতে হবে।

পরিশিষ্ট :

একজন মানুষের জন্য দ্বীনদারী বা পরহেযগারিতা ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তার দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক ক্ষতি নিহিত। সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, أَيُّمَا عَبْدٌ لَمْ يَتَوَرَّعْ وَلَمْ يَسْتَعْمَلِ الْوَرَعَ فِي عَمَلِهِ اِنْتَشَرَتْ جَوَارِحُهُ فِي الْمَعَاصِي وَصَارَ قَلْبُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ وَمُلْكِهِ ‘যখন কোন বান্দা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে না এবং আমল করার ক্ষেত্রে সে পরহেযগারিতাকে কাজে লাগায় না। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ধীরে ধীরে তার অন্তর শয়তানের হাতে বা কব্জায় চলে যায়। তখন তার থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে’।[১১]

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ তাক্বওয়া বা দ্বীনদারী অবলম্বন না করার কারণে তার আমলসমূহ বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ তার আমল কোন কাজে আসে না। ইয়াস ইবনু মু‘আবিয়া (রহঃ) বলেন, যে কাজ পরহেযগারিতা-দ্বীনদারী বা তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা অবশ্যই অনর্থক।[১২] বরং পরহেযগারিতা বা তাক্বওয়া ছেড়ে দেয়া উম্মতে মুসলিমাকে ধ্বংস করে দেয়। আর পরহেযগারিতা বা তাক্বওয়া ছেড়ে দেয়া মুসলিম উম্মাহর ভাল কাজগুলোকে সমূলে উৎখাতের কারণ হয়। সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, تَظْهَرُ فِي النَّاسِ أَشْيَاءَ يَنْزَعُ مِنْهُمُ الْخُشُوْعَ بِتَرْكِهِمُ الْوَرَعَ ‘পরহেযগারিতা ছেড়ে দেয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে, যা মানুষের বিনয়কে মানুষ থেকে তুলে নিবে’।[১৩]

পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী জোর করে সাব্যস্ত করার বিষয় নয় যে, একজন ব্যক্তি জোর করে বা দাবি করে পরহেযগার হতে পারবে। বরং তা অর্জন করার জন্য আমল করতে হবে এবং সাধনা বা গবেষণা করতে হবে।

যারা হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে না এবং হালাল হারাম বেঁচে চলে না, তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা দাবি করা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। হাতেম (রহঃ) বলেন, مَنْ ادعَى حُبَّ اللهِ بِغَيْرِ وَرْعٍ عَنْ مُحَارِمِهِ فَهُوَ كَذَّابٌ ‘যে ব্যক্তি হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে না, অথচ আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে, সে অবশ্যই মিথ্যুক’।[১৪]

একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হ’ল, তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য যেন হয়, দ্বীনের বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করা। আল্লাহ তা‘আলার ভয়কে কাজে লাগানো এবং আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ও নিষেধ থেকে সব সময় সতর্ক থাকা।

وَوَاظِبْ عَلَى التَّقْوَى وَكُنْ مُتَوَرِّعاً + صَبُوراً عَلَى الْبَلْوَى وَبِالدِّينِ كُنْ شَهْمَا ‘তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তুমি পরহেযগার হও। বিপদে তুমি ধৈর্যশীল থাক এবং দ্বীনের বিষয়ে তুমি বিচক্ষণ হও’।[১৫]

উপসংহার ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুত্তাক্বী বানিয়ে দাও অথবা আমাদেরকে সকল কাজে হেদায়াত দান কর। আর তাক্বওয়া বৃদ্ধি করে দাও এবং জান্নাতকে আমাদের গন্তব্যস্থল বানাও। আর আমাদেরকে তুমি এমন শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান কর, যা তোমাকে খুশী করে। আর তুমি আমাদেরকে এমন পরহেযগারিতা দান কর, যা আমাদেরকে তোমার নাফরমানির মাঝে দেয়াল হিসাবে বিবেচিত হয়। আর তুমি আমাদেরকে এমন চরিত্র দান কর, যা দ্বারা আমরা মানুষের মাঝে আদর্শ হতে পারি। আর আমাদেরকে তুমি এমন জ্ঞান দান কর, যদ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের পথপ্রদর্শক বানাও। আপনি আমাদের পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর আপনি আমাদের সকলের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর সকল প্রশংসা তার জন্য যার অপার অনুগ্রহে যাবতীয় সৎআমলসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বিল আলামীন।

[লেখক : শিক্ষক, ইক্বরা ইসলামিয়া মডেল মাদরাসা, বি-বাড়িয়া]

১০. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১১১ পৃঃ।
১১. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫ পৃঃ।
১২. তাহযীবুল কামাল ৩/৪১৩ পৃঃ।
১৩. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৬ পৃঃ।
১৪. হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/৭৫ পৃঃ।।
১৫. নুশরাতি আত-তা‘রীফ ৮৫ পৃঃ।

বারাকাহ : মুমিন জীবনে এর প্রভাব

-ড. মুখতারুল ইসলাম

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন নে'মতরাজি দিয়ে ধন্য করেছেন। বরকত হ'ল মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তির একটি বিষয়। মানুষ দুনিয়াতে হয় বরকত লাভে ধন্য হয়, নতুবা বরকতশূন্যভাবে জীবনযাপন করে। নিম্নে আমরা বরকত কি এবং কিভাবে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত লাভ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

বরকত কি?

اَلْبَرَكَةُ শব্দটির অর্থ হ'ল النماء والزيادة অতিরিক্ত, প্রাচুর্যতা। অন্তরের মধ্যে প্রবল লোভ, তীব্র লালসা, স্বার্থপরায়ণতা, অতৃপ্ত থাকা, অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতা, অত্যধিক মতলবী হওয়া, বিদ্বেষ ও অমঙ্গল, দরিদ্র্যতা বা দীনতা, উদ্বেগ ও অস্বস্তিকর অবস্থা এবং অশান্ত মনোভাব বিরাজ করার বিপরীতে অধিকতর কল্যাণ ও মঙ্গল অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য, সুখ, সুস্থতা, তৃপ্তি এবং মনের মধ্যে নিরাপত্তা, আরাম ও প্রশান্তি অনুভব করা এবং সর্বপ্রকার ভয় ও উদ্বেগ হ'তে নিরাপত্তার উপলব্ধির নাম হ'ল বরকত।

এটি এমন একটি এলাহী কল্যাণ, যা বান্দার উপর নাযিল করা হয়। বরকত হ'ল মহান আল্লাহ্র এমন গোপন সেনাবাহিনী, যা মানুষের অলক্ষ্যেই তার জীবনে পরিলক্ষিত হয়। পাপী হৃদয় কখনো বরকতের এই অনুপম স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। কেবল 'কালবুন সালীম' বা নিষ্কুষ আত্মা এর যথাযথ প্রাপ্তির হকদার।

আল্লাহ সব বরকতের উৎস : তাওহীদী বিশ্বাসই একক সত্ত্বা মহান আল্লাহ্র সব বরকতের উৎসস্থল। সেখান থেকেই বান্দাদের প্রতি বরকতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। তিনি যাকে ইচ্ছা বরকত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করেন। সব বরকত ও কল্যাণের অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সকল রাজত্ব এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(মুলক ৬৭/১)*।

বরকতময় জীবনের প্রার্থনা : বরকত বান্দার জন্য চাওয়ার ও পাওয়ার বিষয়। কেবল সম্পদের প্রাচুর্য, সন্তান-সন্ততির আধিক্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ মুমিনের কাছে 'বরকত' নয়, যদি তা উপকারী ও কল্যাণকর না হয়। মুমিনের কাছে বরকতময় জীবন অবশ্যই কাম্য। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র কাছে বরকত লাভের দো'আ করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ 'একদিন আইয়ূব (আঃ) কাপড় খুলে গোসল করছিলেন। তখন তাঁর ওপর সোনার পঙ্গপাল এসে পড়ছিল এবং তা কুড়িয়ে কাপড়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিপালক তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি যা দেখেছ আমি কি তা থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করিনি। তিনি বললেন, আপনার সম্মানের কসম! অবশ্যই করেছেন। কিন্তু আপনার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই'।[১] এ জন্য রাসূল (ছাঃ) সম্পদ বৃদ্ধির দো'আ না করে প্রাপ্ত সম্পদের কল্যাণ ও সুফল বৃদ্ধির দো'আ করতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো দো'আ কুনূতের মধ্যে বরকতের স্বরূপ স্পষ্টরুপে ফুটে উঠেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ 'তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও'। তুমি যে মন্দ ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান'।[২]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِى حَقِّهِ، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ الَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. 'এ পৃথিবীর ধনদৌলত সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎভাবে ব্যয় করবে, তা তার জন্য খুবই উপকারী (বরকতময়) হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না'।[৩]

মুমিন জীবনে বরকত : মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا-وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- 'শিশুটি

১. *বুখারী হা/২৭৯; মিশকাত হা/৫৭০৭।*
২. *আবুদাউদ হা/১৪২৫; মিশকাত হা/১২৭৩।*
৩. *বুখারী হা/৬৪২৭; মিশকাত হা/৫১৬২।*

(ঈসা আঃ) বলে উঠল, আমি আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আর তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছালাতের ও যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকি' *(মারইয়াম ১৯/৩১)*। দুনিয়াতে সকল নবী-রাসূলই বরকতময় জীবনের আদর্শ পুরুষ। অতএব মুমিন-মুসলমান তাদের অনুসৃত পথে চলতে পারলেই বরবকতময় সুখী জীবন লাভ করতে পারবে অন্যথায় নয়। মুমিন জীবনে বরকত প্রাপ্তির প্রকৃতি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

সময় ও সুস্থতায় বরকত : মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের উপরে সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল অবসর সময় ও সুস্থতা। দেহ-মন সুস্থ না থাকলে দুনিয়ার অন্য সকল নে'মত ও বরকত অকেজো হয়ে পড়ে। সকল ইবাদতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন মানুষ অবসর ও সুস্থতা নিয়ে আফসোস করতে থাকে। পুনরায় সেগুলো ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু সে ফুরছত আর কয়জনের জীবনেই বা মিলে।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অবসর সময়। মানুষের জীবনটাই সময়ের সাথে বাধা। একটা নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সময়ের মধ্যেও মহান আল্লাহ বরকতের বারিধারা বর্ষণ করেন। যেমন একজন ব্যক্তির দশ ঘন্টা ঘুমিয়েও তার ক্লান্তি দূর হয় না, অলসতা বোধ করে। অথচ তার পাশেই আরেকজন ভাই পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়েও পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করে। সকালে সে ঘুম থেকে তরতাজা শরীর ও মন নিয়ে শয্যা ত্যাগ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'এমন দু'টি নে'মত আছে, যে দু'টোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর'।[৪]

রূযীতে বরকত : মানুষের জীবনধারণের অন্যতম মাধ্যম মহান আল্লাহ্র বন্টনকৃত রূযী। এই রূযীও অনেক সময় বরকতশূন্য হয়ে পড়ে বান্দার পাপের কারণে। সমাজের অনেক বিত্তশালী, ধনী, বড় চাকুরীজীবীকে দেখা যায় তার নুন আনতে পান্না ফুরানোর দশা। কিন্তু পাশেই জীর্ণশীর্ণ পর্ণ কুটিরে বসবাসরত অনেক দিনে আনে দিন খাওয়া মানুষের সন্ধান মিলবে যাদের স্বল্প কামাই কিন্তু বরকতময় সুখী জীবন। দিন চলে যায়। কিন্তু কারো নিকটে হাত পাততে হয় না। আর বিত্তশালীর ঘাড়ে ঋণের বোঝা। এত কামাই তবুও তার সংসারে অভাব দূর হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর তুমি তা না করলে আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করবো না'।[৫]

ইলমে বরকত : ইলম বা জ্ঞানে বরকতের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। উপকারী ইলমের অধিকারী আলেমদের কাছে জাতি সর্বদা উপকৃত হয়। কিন্তু রিয়া বা লৌকিকতা, সুখ্যাতি প্রাপ্তির দোষে দুষ্ট বরকতহীন আলেমের জন্য কিয়ামতের মাঠে তার বিদ্যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একজন মুসলিম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকতপ্রাপ্ত হলে সে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে। ইলম তথা শিক্ষা ও ঈমানের মাধ্যমে প্রাণবন্ত অন্তর লাভ করবে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন। রাতে আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি তৈরী করে রাখলাম। মায়মূনা (রাঃ) তাঁকে বললেন, এটা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রেখেছে। তিনি দো'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করো'।[৬] আল্লাহ তাঁর এ দো'আ কবুল করেছিলেন পরবর্তীতে সত্যিই রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর প্রতিফলন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মধ্যে বিশ্ববাসী দেখেছে।

বরকতময় ইলমের অধিকারী ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য থাকবে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। তার ইলম যদি দুনিয়াবী লোভের রং-তামাশার স্রোতে ভেসে যায়, তাহলে নিজে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার বিদ্যা কোন কাজে আসবে না। একটি আয়াত বা হাদীছ জানা থাকলেও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। রিয়া ও সুম'আর মত ভাইরাসে যদি কোন আলেম আক্রান্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার ইহকালও শেষ এবং পরকালও শেষ। বরকতশূন্য কষ্টকর জীবন তাকে আলিঙ্গন করবে।

৪. *বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।*
৫. *তিরমিযী হা/২৪৬৬; মিশকাত হা/৫১৭২।*
৬. *আহমাদ হা/৩০০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮৯।*

বাড়িতে বরকত : নিজের বাড়িও বরকত নাযিলের একটি অন্যতম জায়গা। প্রতিটি বাড়িতে বরকতের ফেরেশতা অথবা শয়তান বসবাস করে। মহান আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ 'আরও বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কল্যাণকরভাবে অবতরণ করাও। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী' *(মুমিনূন ২৩/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ. 'বনী আদমের সৌভাগ্য রয়েছে তিনটি জিনিসে-পার দ্বীনদার সহধর্মিণী, ভাল (বরকতময়) বাড়ি ও ভাল যানবাহন এবং দুর্ভাগ্য রয়েছে তিনটি জিনিসে- অসৎ সঙ্গিনী, খারাপ (বরকতহীন) বাড়ি এবং যানবাহন'।[৭]

বরকত লাভের উপায়সমূহ

১. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি : তাকওয়ার ছায়াতলেই সকল কল্যাণ, সৌভাগ্য ও বরকতের বসবাস। আল্লাহ্র প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে তাকে যথাযথ ভয় করলে তিনি বান্দার প্রতি বরকত বা কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। মহান আরো বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'যদি জনপদের মানুষগুলো ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের দরজা খুলে দিতাম। কিন্তু তা না করে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের দরুণ' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

যখনই একজন মানুষ সব হারাম থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং সব বিষয়ে বেশী বেশী আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দার জন্য আসমান ও যমীনের সব বরকতের দুয়ার খুলে দেন।

২. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা : আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখাকে তাওয়াক্কুল বলে। এর দ্বারাও জীবনের পেরেশানী দূর হয়। কাজে-কর্মে বরকত লাভ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সেই রূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে নিজে স্বরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. 'যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্র ওপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাখির মতো রিজিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালি পেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে'।[৯]

মুমিন যত বেশী আল্লাহ্র ওপর ভরসা করবে তত বেশী সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র প্রতি আস্থা, নির্ভরতা বা ভরসা যত বেশী কমবে, সে তত বেশী অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

বিপদে অনেকেই আল্লাহ্র প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অনেক সময় আল্লাহ সম্পর্কে নানান মন্তব্যও করে বসেন। না তা কোনোভাবেই ঠিক নয়। মহান আল্লাহ সকল বরকতের উৎসস্থল। তিনি যদি কোন বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান,

৭. *মুসতাদরাকে হাকেম হা/২৬৪০।*

৮. *বুখারী হা/৭৪০৫; মিশকাত হা/২২৬৫।*
৯. *তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯।*

তাহলে সে বান্দার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অতএব তাকদীরের ভাল-মন্দের উপরে বিশ্বাসকে দৃঢ় রেখে মহান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে পারলে সে মুমিনের জীবন বরকতময় হয়ে উঠবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন : এই ফিৎনা-ফাসাদপূর্ণ দুনিয়ায় আল্লাহ্র রহমত-বরকত পেতে জামা'আতবদ্ধ তথা সাংগঠনিক জীবনযাপনের বিকল্প নেই। জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য স্বীয় উম্মতকে রাসূল (ছাঃ) যোর তাকীদ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. 'তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দু'জন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। যার সৎআমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদআমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার'।[১০]

হাদীছে এসেছে, حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ« 'ওয়াহশী ইবনু হারব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা খাবার খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন, হয় তো তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাও। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা একত্রে আহার করো এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে বরকত দেয়া হবে। ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, যদি তোমাকে কোথাও দাওয়াত করা হয় এবং খাবার সামনে রাখা হয় তাহলে বাড়ির কর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত খাওয়া শুরু করবে না'।[১১] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'জামা'আত বা সংগঠনের ওপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১২] অর্থাৎ জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্যেই আল্লাহ্র বরকত নিহিত। কেননা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন হ'ল আযাবের এবং জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন হ'ল রহমতের।

জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের শিক্ষা রাসূল (ছাঃ) ইসলাম আসার পূর্বেই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়নি তার পূর্বেই মাযলূম মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের কথা মাথায় রেখে তিনি 'হিলফুল ফুযূল' সংগঠন কায়েম করেছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজ সংস্কারের মত মহান দায়িত্ব পালন করতে গেলে একাকী কখনো সম্ভব নয়। তা না হ'লে বাতিল খুব সহজেই ঘাড় মটকাবে। বাতিলের চাপিয়ে দেওয়া সর্বগ্রাসী বিপদ থেকে মহান আল্লাহ্র সাহায্য, রহমত ও বরকতের খুবই প্রয়োজন। আর তা অর্জিত হ'তে পারে মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমেই। মা খাদীজা (আঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যে তা সহজেই অনুমেয়। মা খাদীজা (আঃ) বলেন, كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. 'আল্লাহ্র কসম, কখনই নয়। আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায়-দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথে থাকা দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন'।[১৩]

৪. কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো : কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো খুবই যরূরী। কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার মাধ্যমে বরকত অর্জিত হয়। যে যত বেশী কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াবে তার জন্য তত বেশী বরকত নেমে আসবে।

যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হবে, কুরআনের চর্চা হবে, কুরআনের ওপর আমল করা হবে, সে ঘরেই নেমে আসবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত ও কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'আর এই কিতাব (কুরআন) আমরা নাযিল করেছি যা বরকতমণ্ডিত। সুতরাং এটির (আদেশ সমূহ) অনুসরণ কর এবং (নিষেধ সমূহে) ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার' *(আনা'আম ৬/১৫৫)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু পাপীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(ইসরা ১৭/৮২)*।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠে রহমত ও বরকতের কথা পবিত্র সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সূরা কাহাফ পাঠ করার ফলে এক ছাহাবীর বাড়িতে মেঘমালা সদৃশ বরকত

১০. তিরমিযী হা/২১৬৫; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৩৮৭।
১১. আবুদাউদ হা/৩৭৬৪।
১২. তিরিমিযী হা/২১৬৬।
১৩. বুখারী হা/৩; মিশকাত হা/৫৮৪১।

নাযিল হয়েছিল যা আমাদের সকলেরই জানা। হাদীছে এসেছে, قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ، وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِى الدَّارِ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، وَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ. নবী করীম (ছাঃ)-এর জনকৈ ছাহাবী কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ তা পালাতে লাগলো। সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি পালিয়েই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো তখন তিনি ঘটনাটি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এ হলো সেই সাকীনা বা প্রশান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় অবতীর্ণ হয়ে থাকে'।[১৪]

যারা কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করবেন, তাদের জন্য এ কিতাব হবে বরকতের কারণ। আর যারা এ থেকে দূরে সরে যাবে, তা হবে তাদের জন্য অমঙ্গলের কারণ।

৫. প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি নে'মত-বরকতে অংশগ্রহণ করে তাতে ভাগ বসাতে চায় এবং তা নষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং সবার অলক্ষ্যে তা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়াস চালায়। কিন্তু অনেক সময় আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না। এজন্য রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ষাকবচ হিসাবে আমাদের মহান আল্লাহর নামের কালিমা 'বিসমিল্লাহ' শিখিয়েছেন। যখন কোন খাবার খায় আর যদি বিসমিল্লাহ বলে, তবে শয়তান ওই খাবারে অংশ নিতে পারে না। যেটুকু খাবার আছে তা (পরিমাণে কম হলেও) তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ঘরে প্রবেশ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে তখনও শয়তান তার সঙ্গে বাসায় ঢুকতে পারে না। এভাবে বান্দা যখন সব কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে, তখন শয়তান সব কিছু থেকে মাহরূম হয়। আর আল্লাহ তা'আলা সব কাজেই বরকত দান করেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. 'যখন কোন লোক তার গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও আহারকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান তার সাথীদের বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে কিন্তু প্রবেশকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিবাসের (থাকার) জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে আহারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তখন সে বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা হল'।[১৫] বরকতের জন্য যদি কেউ খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়। তাহলে ইসলাম সে বিষয়ে প্রতিষেধক স্বরূপ 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু' বলতে শিখিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি মজাদার হাদীছ এসেছে, إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ طَعَامِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ مَا زَالَ أَوَّلَهِ وَآخِرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلَّا قَاءَهُ 'রাসূল (ছাঃ) দেখল, একদিন জনৈক ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' না পড়েই খাওয়া শুরু করল, অবশেষে তার খাওয়া যখন প্রায় শেষ এমতাবস্থায় সে 'বিসমিল্লাহি আওওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ' (খাবারের প্রথমে এবং শেষে আল্লাহর নামে) বলল। তার অবস্থা দেখে নবী করীম (ছাঃ) অতঃপর বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ঐ লোকটির সঙ্গে খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল, তখনই শয়তান তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল, তা উগরে করে দিল'।[১৬] অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَافَتَيْهِ، وَلَا الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ وَسَلَّمَ قَالَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, খাদ্যের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। অতএব তোমরা এর কিনারা হতে খাওয়া আরম্ভ কর, মাঝখান হতে খেও না'।[১৭]

৬. সকাল সকাল প্রতিটি কাজ শুরু করা : সকালের বরকতময় সময়ে ছোট বা বড় যে কোন কাজ দিয়ে আমাদের দিনটা শুরু হওয়া উচিৎ। তাহলে প্রতিটি কাজই আমাদের ফলপ্রসূ হবে। কথায় আছে, 'সকালের হাওয়া লাখ টাকার দাওয়া'। অথচ সকালে ঘুমানো আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন সকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত নাযিল হয়, তখন আমরা ঘুমে বিভোর থাকি। আর এজন্য একটি জাতি অর্থব ও পঙ্গু হয়ে যাওয়ার জন্য এই একটি মাত্র বাজে অভ্যাসই যথেষ্ট। অথচ সুন্নাত হচ্ছে ফজরের পর না ঘুমিয়ে যিকর-আযকারে সময় ব্যয় করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেছেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরু (সকাল) বরকতময় করুন।' বর্ণনাকারী বলেন, 'এ জন্যই রাসূল (ছাঃ) কোনো যুদ্ধ অভিযানে বাহিনী পাঠানোর সময় দিনের শুরুতে

১৪. বুখারী হা/৪৮৩৯; মিশকাত হা/২১১৭।

১৫. মুসলিম হা/২০১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৪১৬১।
১৬. মুসতাদরাকে হাকেম হা/৭০৮৯।
১৭. তিরমিযী হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪২১১।

পাঠাতেন। আর ছাখার (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনিও তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভোরবেলা শুরু করতেন। এতে তাঁর ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি সীমাহীন প্রাচুর্য লাভ করেন'।[১৮]

সালাফরা ফজরের পর ঘুমানোকে মাকরূহ মনে করতেন। উরওয়া (রহঃ) বলেন, إِنِّي لَأَسْمَعُ بِالرَّجُلِ يَتَصَبَّحُ فَأَزْهَدُ فِيهِ 'আমি যখন কারো সর্ম্পকে শুনি যে সে ভোরবেলা ঘুমায়, তখন তার প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি'।[১৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর এক সন্তানকে ভোরবেলা ঘুমাতে দেখে বলেছিলেন, أتنام في الساعة التي تُقسَّم فيها الأرزاق؟ 'উঠ! তুমি কি এমন সময়ে ঘুমিয়ে আছ, যখন রিযিক বণ্টন করা হয়?[২০]

৭. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা : আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে বরকত ও কল্যাণ নেমে আসে। আত্মীয়-স্বজন তথা মা-বাবা, ভাই বোন তথা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। অথচ বর্তমান সমাজে এর বিপরীতটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আত্মীয়দের কেউ খারাপ আচরণ করলেও তাদের সঙ্গে নিজ থেকে সুসম্পর্ক রাখা মুমিনের কর্তব্য। হাদীছে এসেছে, أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. 'এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ রক্ষা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করি; কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের সঙ্গে সহনশীল ব্যবহার করি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে। তখন তিনি বললেন, তুমি যা বললে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয় তাহলে তুমি যেন তাদের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফিরিশতা) থাকবে, যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকবে'।[২১] সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হবে, সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য করা। সাহায্য করতে না পারলে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। আর এর মাধ্যমে নেমে আসবে বরকত ও কল্যাণ। আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখলে আল্লাহ তা'আলা জীবনে ও রিযিকে অফুরন্ত বরকত দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে'।[২২]

৮. বেচাকেনায় সততা : সৎভাবে ব্যবসা করা ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত। যারা ব্যবসায় সততা বজায় রাখে, মহান আল্লাহ তাদের বরকত দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের এখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে; আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়'।[২৩]

৯. সালাম দেওয়া : সালাম মহান আল্লাহ্‌র একটি ছিফাতী নাম, যার অর্থ হ'ল মনে প্রশান্তিদাতা। সকল শান্তি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। দুনিয়ায় সবকিছুই মানুষ করে একটু সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু সেই সুখ-শান্তি আজকে কোথায়? কবি বলেন, সুখ সুখ বলে তুমি কেন কর হা-হুতাশ, সুখ তো পাবে না কোথা বৃথা সুখের আশ'।

মুসলমানরা পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম তথা শান্তির দো'আ করবে অর্থাৎ সালাম করবে। তাতেই মহান আল্লাহ্‌র বরকত, রহমত ও সুখ-শান্তি বান্দা অনুভব করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেব, যার উপর আমল করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (তা হলো) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে'।[২৪]

১০. দান করা : বেশী বেশী দান ও সাহায্য-সহযোগিতায় বরকত নেমে আসে। দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিপদ-মুছীবত দূর করে দেন। বান্দার উপর বেশী বেশী বরকত নাযিল করেন। সে কারণেই সব কাজে বরকত লাভে বেশী বেশী দান করা উচিৎ। হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি খরচ করো, আমিও তোমার জন্য খরচ করব'।[২৫]

আসলে বান্দা উপর মহান আল্লাহ কিভাবে খরচ করবেন? মূলতঃ এর তাৎপর্য হলো বান্দার রুযীতে বহুগুণে বরকত বাড়িয়ে দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ)

১৮. *তিরমিযী হা/২৬০৬; মিশকাত হা/৩৯০৮।*
১৯. *মুছান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ ৫/২২২ পৃঃ।*
২০. *যাদুল মা'আদ ৪/২৪১ পৃঃ।*
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২৪।*
২২. *বুখারী হা/২০৬৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।*
২৩. *বুখারী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/২৮০২।*
২৪. *আবুদাউদ হা/৫১৯৩; মিশকাত হা/৪৬৩১।*
২৫. *বুখারী হা/৫৩৫২; মিশকাত হা/১৮৬২।*

স্বীয় উম্মতকে দান করার কিছু যদি না থাকে তবে একটি খেজুরের অংশ দিয়ে হলেও দান করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে বলেছেন।

প্রত্যেক সকালে দানশীল বা কৃপণ নির্ধারণ করার জন্য ফেরেশতাদের মহান আল্লাহ যমীনে নামিয়ে দেন। তারা দানশীলদের সম্পদ বৃদ্ধির দো'আ করে এবং কৃপণের ধ্বংস কামনা করে। তাই প্রত্যহ সকালবেলা দান দিয়ে শুরু হৌক আমাদের পথচলা।

১১. বেশী বেশী ইসতেগফার করা : জীবনে বরকত লাভের অন্যতম আমল হ'ল বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর কোনো হিসাব বা সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করে করা যাবে না। বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই ইসতেগফার করতে হবে। অন্তত এটুকু বলা উচিৎ- اَسْتَغْفِرُاللهُ – اَسْتَغْفِرُاللهُ। রাসূল (ছাঃ) দিনেরাতে একশরও অধিকবার মহান আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا – يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا – وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا 'অতঃপর বলেছি, 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*

কেননা বান্দার পাপের জন্য বরকত নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নেকীর কাজে আয়ু বাড়ে, দো'আই ভাগ্য প্রতিহত করে, বান্দার পাপের কারণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়'।[২৬] তাই সবসময় ইসতেগফার পড়ার মাধ্যমে দুনিয়ার বরকত ও কল্যাণ লাভ করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

১২. দো'আ করা : দো'আ সকল বরকত ও কল্যাণ হাছিলের এক অনন্য মাধ্যম। বান্দা সর্বদা দো'আ করার মাধ্যমে বরকত লাভের জন্য তার জিহ্বাটা সবসময় ভিজিয়ে রাখবে। দো'আর বিষয়টি পুরো জীবন তথা সাংসারিক, পারিবারিকসহ পার্থিব জীবনের চলায়-বলায় সর্বত্র প্রয়োজন হয়। অনেকেই দো'আ করতে অভ্যস্ত নয়। আবার কেউ দো'আ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়ে। দো'আ এমনটা একটি বিষয় যার ফলাফল ইহকালে অথবা মহান আল্লাহ নিজ হাতে দো'আকারীকে দান করবেন। শুধু নিজে দো'আ করা নয় বরং অন্য দ্বীনদার-পরহেযগার মানুষের নিকট থেকে বরকতের দো'আ চেয়ে নিতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, সুলাইম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পিতার ঘরে এলে তিনি তাঁর সামনে খাদ্য পরিবেশন করলেন। তিনি 'হাইস' নামক খাবারের কথা উল্লেখ করলে তা তাঁর কাছে নিয়ে আসা হ'ল। অতঃপর তিনি শরবত আনলেন এবং নবী (ছাঃ) তা পান করলেন। তারপর ডান দিক হ'তে পরিবেশন করা হলো। তিনি খেজুর খেলেন এবং বিচিগুলো তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের পেটের ওপর রাখলেন। যখন তিনি বিদায় নিতে উঠলেন, আমার পিতাও দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর জন্তুযানের লাগাম ধরে বলেন, আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দো'আ করুন। তিনি দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের দেওয়া রিযিকে বরকত দিন, তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন'।[২৭]

১৩. ইস্তিখারা করা : ইস্তিখারা বলা হয় ছালাত ও দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র দরবারে কোনো বিষয়ের কল্যাণ চাওয়া। এর মাধ্যমেও বরকত অর্জিত হয়। জীবনের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইস্তিখারার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া প্রতিটি মানুষের উচিৎ। কেননা যেকোন বিষয়ের ভালমন্দের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। তার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত তালাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। তাতে মা'বূদ ও বান্দার মাঝে এক অনন্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা বান্দার জন্য পুরোটা কল্যাণকর। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ সালামি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবাদের সব কাজে এভাবে ইস্তিখারার শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন'।[২৮]

উপসংহার : মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বান্দার জন্য সর্বত্র বরকত ছিটিয়ে রেখেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো প্রতিটি কথাকর্মই বরকতে পরিপূর্ণ। সকল মুমিনকে রাসূল (ছাঃ)-এর বাতলিয়ে দেওয়া বরকতময় পথ-মতকে অগ্রাধিকার ও সৎ আমল-আখলাকের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা চালাতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

২৬. মুসতাদরাকে হাকেম হা/১৮১৪; ইবনে মাজাহ হা/৪০২২; মিশকাত হা/৪৯২৫।

২৭. আবুদাউদ হা/৩৭২৯।

২৮. বুখারী হা/৭৩৯০; মিশকাত হা/১৩২৩।

ইসমাঈলী শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-ড. মুখতারুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

(চ) পরকাল ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা :

ইসমাঈলীদের পরকাল বিষয়ক আক্বীদাগুলো নিম্নরূপ-

১. মৃত্যুর পর মানুষের গন্তব্য :

ইসমাইলীদের বিশ্বাসানুযায়ী মানুষ দুইভাগে বিভক্ত। মুমিন-আউলিয়া এবং বিভ্রান্ত চরমপন্থী। মুমিন আউলিয়াগণ সমসাময়িক ইমামগণের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হবেন এবং তার বেলায়েতের একনিষ্ঠ বাস্তবায়নকারী হবেন। অপরদিকে বিভ্রান্ত চরমপন্থীরা সমসাময়িক ইমামগণের বিরোধী হবে এবং তার বেলায়েতের ব্যাপারে হিংসুটে ও চরমপন্থী হবে। ইমামের বেলায়েত ও দাওয়াতের পরিপন্থী কাজে সে জড়িত থাকবে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুমিন আউলিয়াগণের আত্মাগুলো মৃত্যুর পরও সুন্দর অবয়বে ও আকৃতিতে অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তাদের দেহগুলো বিশেষভাবে সংরক্ষিত থাকবে। অপরপক্ষে বিভ্রান্ত চরমপন্থীগণের আত্মাগুলো নোংরা ও কদর্য অবস্থায় পড়ে থাকবে এবং অন্য কোন আকৃতিতে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।[১]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ

১. আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যদের সাতটি চেহারায় সৃষ্টি করেছেন। তারা সে সমস্ত চেহারায় পরিবর্তিত হবে। অবশেষে দুনিয়ায় অন্যভাবে ফিরে আসবে।[২]

২. তোমাদের সাথে তাদের দেখা হবে। তুমি মনে করবে আদম সন্তান। কিন্তু তারা বানর, কুকুর, শুকর, ভল্লুক পরিণত হয়ে মানুষের মাঝে আসবে।[৩]

২. ক্বিয়ামত

ইসমাঈলীদের নিকট ক্বিয়ামত হ'ল ছাহেবুয যামান বা ইমামের আর্বিভাব। ইসলামে ঘোষিত কিয়ামতকে তারা বিশ্বাস করে না।

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. তাদের মতে, ক্বিয়ামত হ'ল আত্মার আংশিক জাগরণ ও দেহযন্ত্র থেকে সংবেদনশীলতার পৃথকীকরণ। আর ছাহেবুয যামান তথা ইমামের মাধ্যমে শরী'আত ও দ্বীন ধর্মকে সমুন্নত করণের নাম।[৪]

২. জা'ফর ইবন মানছূরুল ইয়ামান তার তাফসীরে লিখেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا-يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا 'নিশ্চয়ই বিচার দিবস সুনির্ধারিত। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।[৫] (يَوْمَ الْفَصْلِ) ফায়ছালার দিনে ইমাম মাহদী আসবেন। তিনি হক-বাতিলের মাঝে ফায়ছালা করবেন এবং মানুষের মাঝে মুমিন, কাফেরকে পৃথক করবেন। (مِيقَاتًا) অর্থাৎ নির্ধারিত স্থান, যা দ্বারা আল্লাহ্র আদেশের সর্বশেষ সীমা এবং সাতজন নাতেক বা কথককে বুঝানো হয়েছে। (يُنْفَخُ) অর্থাৎ ফুৎকার দেওয়া বা ইমামের পক্ষ থেকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া। তাঁর আদেশ প্রকাশ পাওয়ার পর মানুষেরা তার দাওয়াতে স্বেচ্ছায় দলে দলে ইমামতে প্রবেশ করবে।[৬]

ইসমাঈলীদের বিশ্বাস সপ্তম ইমাম ও কথক মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈলের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আত রহিত হয়ে গেছে। কেননা তিনি ইমামদের সিলসিলায় সপ্তম কথক এবং তার ক্ষমতা বা ইমামতে সমাসীন বা কায়েম হওয়ার মধ্যে দিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আত বাতিল ও তাদের শরী'আত বলবৎ হয়েছে। এভাবেই অনেক ইসমাঈলী ইমাম ও দাঈরা ক্বিয়ামতের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।[৭]

ইসমাঈলীরা সপ্তম ইমামের ইমামত কায়েম হওয়াকে ক্বিয়ামত ব্যাখ্যা দেন। তারা মনে করে তার নিকটেই হিসাব ও বিচার হবে এবং শাস্তিদানে তিনি অত্যন্ত কঠোর। যেমন তার সত্যায়নে মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'যেদিন তারা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আল্লাহ্র কাছে তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (সেদিন তিনি বলবেন) আজ রাজত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহ্র, যিনি এক ও মহাপরাক্রান্ত।[৮]

৩. শাস্তি ও পুরস্কার

এর প্রমাণে তারা মহান আল্লাহ্র বাণী উল্লেখ করে বলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ-ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ-ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে।

---

১. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।*
২. *তদেব, পৃ. ৪৩৯; গৃহীত : মুফাযযাল জু'ফী, ওয়াল হাফতুশ শরীফ, পৃ. ২৬।*
৩. *তদেব; গৃহীত : মুফাযযাল জু'ফী, ওয়াল হাফতুশ শরীফ, পৃ. ৩৬।*
৪. *তদেব, পৃ. ৪৪১।*
৫. *আল-কুরআন, সূরা নাবা, আয়াত-৭৮/১৭-১৮।*
৬. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪২; গৃহীত : জা'ফর ইবন মানছূরুল ইয়ামান, কিতাবুল কাশফ, পৃ. ১৭০।*
৭. *তদেব, পৃ. ৪৪৭।*
৮. *আল-কুরআন, সূরা মুমিন, আয়াত-৪০/১৬।*

অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের বলা হবে, এটাই তো সেই স্থান, যাকে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।[৯] তাদের মতে, পুরস্কারের ব্যাখ্যা হ'ল মাওলার দিকে নযর দেয়া ও প্রাণ খুলে দেখা আর শাস্তির ব্যাখ্যা হ'ল তা থেকে ঠেকিয়ে দেওয়া।[১০]

তারা আরো বলে, পুরস্কার বলতে ক্বিয়ামত তথা ইমামের ক্ষমতায়ন ও তার অনুসরণ করাকে বুঝায়। আর শাস্তি হ'ল এর অবাধ্য হওয়া। কেননা প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তার উম্মত দেরকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে।[১১]

৪. মুনকার-নাকীর

তাদের জ্ঞানী সম্প্রদায়ের নিকট এ কথা পরিস্কার যে, ভাল মানুষদের জন্য কবরের ফেরেশতা মুনকার এবং হতভাগ্যদের জন্য নাকীর। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ইমাম তাদের স্বজাতিকে এই দুই ফেরেশতার খবর দিয়েছে। প্রত্যেক যুগে ইমাম হ'ল হুজ্জত ও সুসংবাদদাতা। ফলে তাকে মান্যকারীদের জন্য মুনকার আর তার অবাধ্যদের জন্য নাকীরকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কথা চিরন্তন সবার জন্য, সব সময়।[১২]

তারা আরো বলে, প্রত্যেক নাতেক বা ইমামের জন্য মুনকার-নাকীর অছি স্বরুপ। আউলিয়াদের জন্য মুনকার সুসংবাদ এবং হতভাগ্যদের জন্য নাকীর দুঃসংবাদ।[১৩]

৫. জান্নাত-জাহান্নাম

১. দাঈ সাহরাবুল ফারেসী বলেন, জান্নাত হ'ল সত্যবাদী ও সত্যসেবীদের; যারা আল্লাহ্র বাস্তবতাকে চেনে তাদের জন্য। জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। জ্ঞানী সম্প্রদায় একমাত্র এর মালিক হবেন। এর পাঁচটি উপাদান রয়েছে যথা- খেয়াল, সন্দেহ, জ্ঞান, জান্নাতের পাহারাদার এবং সেই ব্যক্তি যিনি তার জ্ঞানের প্রকৃত অনুসারী।[১৪]

২. তিনি আরো বলেন, জাহীম বা জাহান্নাম ধ্বংস, কষ্টের জায়গা। জাহান্নামবাসী হ'ল ধ্বংসশীল, বাতিলপন্থী। জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 'যার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি নির্দিষ্ট দল রয়েছে।[১৫ ১৬]

৩. আবু ইসহাক কুহুস্তামানী বলে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতী যে সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টিকর্তার দিকে ডাকে। আর জাহান্নামী ঐ ব্যক্তি যে মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর উলূহিয়্যাত থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। জান্নাতীরা আল্লাহ্র একত্ববাদকে আঁকড়ে ধরে। আর জাহান্নামীরা আল্লাহ্র একত্ববাদ ছেড়ে পালায়।[১৭]

উল্লেখ্য যে, তাদের নিকট জান্নাতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধরণের। তবে মূল ব্যাখ্যায় তারা বলে, জান্নাত হ'ল জ্ঞান। আর জান্নাতের সাতটি দরজার ব্যাখ্যা হ'ল সাতটি অক্ষর এবং সাতজন ইমাম। জাহান্নামের সাতটি দরজার ব্যাখ্যা হ'ল সাতজন ইমামের বিরোধীরা।[১৮]

পর্যালোচনা ও জবাব

ইসমাঈলীদের পরকাল সংক্রান্ত আক্বীদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শিক্ষার পুরোপুরি বিরোধী এবং হিন্দু, অগ্নি উপাসক মাজূসী, ইহুদী ধর্মসমূহ ও দর্শন শাস্ত্র থেকে ধার করা। এতদ্ব্যতীত তারা তাদের প্রকাশ্য কিতাবাদির বক্তব্য অস্বীকার করে ও বাতেনী বলে নিজেদের যাহির করে।[১৯]

(ছ) শরী'আত রহিতকরণ ও দায়িত্ব অর্পণ

ইসমাঈলীদের বিশ্বাস হ'ল মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আসার পর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীন ইসলাম রহিত হয়ে গেছে। যেমনভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আসার পর ঈসা (আঃ)-এর রহিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় শরী'আত এখন বাতেনী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।[২০]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ

১. জা'ফর ইবন মানছূর ইয়ামন বলেন, মাহদী আমলবিহীন ইলমের অধিকারী। মাহদী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ফলাফলের জগৎ শুরু হবে। দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে; আখেরাতের দরজা খুলে যাবে; সমস্ত শরী'আত বাতিল বলে গণ্য হবে।[২১]

২. তিনি আরো বলেন, তার আর্বিভাবের পর কোন শরী'আত থাকবে না। সমস্ত শরী'আত বিদূরিত হবে। শুধুমাত্র ব্যাখ্যা রয়ে যাবে।[২২]

৩. আধুনিক ইসমাঈলী আলেম মুছত্বাফা গালিব বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বাতেনী প্রথম ইমাম এবং সপ্তম কথকের পূর্ণতা দানকারী। কেননা তার আমলেই ইসমাঈলী দাওয়াতের ইতিহাসের সূচনা হয়। ফলে পূর্ববর্তী সমস্ত শরী'আত রহিত হয়ে যায়। তিনি তাবীল বা ব্যাখ্যার সূচনা করেন এবং বাতেনী বা গূঢ়তত্ত্বকে গুরুত্বারোপ করেন।[২৩]

পর্যালোচনা ও জবাব

১. মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম'।[২৪]

২. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম'

---

৯. আল-কুরআন, সূরা মুত্বাফফেফীন, আয়াত-৮৩/১৫-১৭।
১০. আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।
১১. তদেব, পৃ. ৪৫৬।
১২. তদেব, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৪৫৮।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৬০।
১৫. সূরা হিজর ১৫/৪৪।
১৬. আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৬১; গৃহীত : আবু ইসহাক, ওয়াহফাত, পৃ. ৪৭, ৪৮।
১৮. তদেব, পৃ. ৪৬১।
১৯. তদেব, পৃ. ৪১৮।
২০. তদেব, পৃ. ৫৫১।
২১. তদেব, পৃ. ৫৬১; গৃহীত : জা'ফর ইবন মানছূর ইয়ামন, তা'বীলুয যাকাত, ৬০ পৃ.।
২২. তদেব, পৃ. ৫৬১।
২৩. তদেব, পৃ. ৫৬৮; গৃহীত : মুছত্বাফা গালিব, তারীখু দা'ওয়াতুল ইসমাঈলিয়াহ, ৩৪ পৃ.।
২৪. সূরা আলে-ইমরান ৩/১৯

ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৫]

৩. মহান আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[২৬]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ فِيهِ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ، إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ-

'আমার এবং অপর নবীগনের দৃষ্টান্ত এক প্রাসাদের মত যাকে খুব সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু উহাতে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়। দর্শকরা এটা প্রত্যক্ষ করে এবং এর সুন্দর নির্মাণশৈলীতে অত্যন্ত মুগ্ধ হত। তবে একটি ইটের জায়গা খালি থাকার কারণে আশ্চর্যবোধ করে। আমার দ্বারা দালানের নির্মাণ কাজ শেষ হ'ল এবং রাসূলগণের আগমনও আমার দ্বারা সমাপ্ত হ'ল। অন্য বর্ণনায় আছে- আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী। আর এক বর্ণনায় রয়েছে- 'আমি শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত।[২৭]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ 'বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উম্মাতদের শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। বরং খলীফাগণ হবেন এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর হবেন।[২৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে সুস্পষ্ট দলীল থাকা সত্ত্বেও ইসমাঈলীরা মুসলিম নাম ধারণ করে বিপরীত কথাবার্তা বলে।[২৯] বর্তমান ইসমাঈলীরা পূর্ববর্তীদের পদাংঙ্ক অনুসরণ করে। তারা ছালাত পড়ে না, যাকাত দেয় না, ছিয়াম রাখে না, মসজিদ বানায় না, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আতের কোন কিছুই তারা মানে না। তারা নিজেদেরকে 'আগাখানিয়াহ' নামে নামাংকিত করে। জুয়া খেলে, মদ পান করে, রাতদিন প্রকাশ্যে আনন্দ-ফূর্তিতে মত্ত থাকে।[৩০]

এজন্য শায়খ ইহসান এলাহী যহীর বলেন, ইসমাঈলীরা তিনটি কারণে কাফের। তাদের বিশ্বাস শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরেও আরো নবী-রাসূল আসবে, ইসলাম রহিত হয়ে গেছে, শরী'আতের দরকার নেই এবং শুধুমাত্র বাতেনী জ্ঞান যথেষ্ট। তারা এ কথাগুলোর মাধ্যমে কুফুরীর উপর কুফুরী করেছে। এরপরেও কি কেউ মুসলমান থাকতে পারে? তাদের সমস্ত আলেম, ফকীহ ও ঐতিহাসিকরা নির্গুনবাদী কাফের, যিন্দীক।[৩১] হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ إِتِّبَاعِيْ.

জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদিন যখন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, আমরা ইহুদীদের নিকটে তাদের অনেক পুরানো ধর্মীয় কাহিনীগুলো শুনি, যা আমাদের নিকটে চমৎকার লাগে। এসব কিছু কিছু লিখে রাখার জন্য আপনি আমাদের অনুমতি দিবেন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি দিকভ্রান্ত হয়েছ, যেমন ইহুদী-নাছারারা দিকভ্রান্ত হয়েছে? অথচ আমি তোমাদের কাছে এসেছি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে। যদি আজকে মূসাও বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকতো না।[৩২]

(জ) যাহেরী-বাতেনী প্রসঙ্গ

ইসমাঈলীদের আক্বীদা হ'ল প্রতিটি জিনিসের যাহের বা প্রকাশ্য, বাতেন বা অপ্রকাশ্য বিষয় রয়েছে। আর তারা বাতেনী ব্যাখ্যার আড়ালে ধর্মের নামে অপব্যাখ্যা করে।

মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ-'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আর এগুলোই হল কিতাবের মূল অংশ। আর কিছু রয়েছে অস্পষ্ট। অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনমত ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর গভীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে, আমরা এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সবকিছুই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না'।[৩৩]

---

২৫. সূরা আলে-ইমরান ৩/৮৫।
২৬. মায়েদাহ, ৫/৩।
২৭. বুখারী হা/৩৫৩৫, ৬৪, ৬৫; মুসলিম হা/২২ (২২৮৬)।
২৮. বুখারী হা/ ৩৪৫৫, ১৬০৪।
২৯. আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮।
৩০. তদেব, পৃ. ৫৬৯।
৩১. তদেব, পৃ. ৫৭০।
৩২. আহমাদ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৭৭।
৩৩. আলে-ইমরান ৩/৭।

www.tawheederdak.com

তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে আল্লাহ্র উক্ত বাণী উল্লেখ করে বলে, আমার নিকট কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে যাহের, বাতেন রয়েছে।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, প্রকৃতার্থে বাতেন বলতে তারা অছি হযরত আলীকে বুঝিয়ে থাকে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আতের নামে হযরত আলী কেন্দ্রীক যাবতীয় মিথ্যাচারকে তারা বাতেন বলে।

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. তাদের মতে, শরী'আত হ'ল যাহের এবং বাতেন তার বাস্তবতা। মুহাম্মাদ (ছাঃ) শরী'আত প্রণেতা এবং বাতেন বা বাস্তব ব্যক্তিত্ব হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অছি আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ)।[৩৫]

২. তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যারোপ করে বলে, আমি ছাহেবুত তানযীল বা অবতীর্ণকারী, আর আলী (রাঃ) ছাহেবুত তা'বীল বা ব্যাখ্যাদানকারী।[৩৬]

৩. তারা বলে, যাহের-বাতেন দ্বীনের যাহের ভিত্তিক তাবলীগের কাজ করেন রাসূল (ছাঃ) এবং দ্বীনের বাকী অর্ধেক বাতেনের দায়িত্ব পালন করেন তার অছি বা আলী (রাঃ)।[৩৭]

তারা রাসূল ও অছির মাঝে যাহের ও বাতেনের নামে দ্বীনকে ভাগ করেছে। অতঃপর অর্ধেক দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর এবং বাকী অর্ধেকের দায়িত্ব অর্পন করেছে তাদের দ্বীনের ভিত্তি আলী (রাঃ)-এর উপরে।[৩৮]

যাহেরী-বাতেনী আক্বীদাসমূহের গুরুত্ব

১. যাহেরপন্থীরা শুধুমাত্র আমল করবে। আর বাতেনপন্থীরা জ্ঞানভিত্তিক কাজে জড়িত থাকবে।[৩৯]

২. তারা বলে, ছাহেবুত তা'বীলকে অস্বীকারকারী কাফের।[৪০]

৩. তারা বলে, যে ব্যক্তি যাহের-বাতেনের উপরে আমল করে, সে আমাদের দলভুক্ত। যে ব্যক্তি বাতেন ব্যতীত শুধু যাহেরের উপর আমল করে, তার চেয়ে কুকুর ভাল। সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৪১]

৪. নাতেক হ'ল শরী'আত প্রণেতা, ছামেত হ'ল শরী'আতের ভিত্তি। আর নাতেক শরী'আত ব্যাখ্যাকারী। রাসূল (ছাঃ) যাহেরী কথাবার্তা বলেন। আর ছামেত বাতেনী বিষয় দেখভাল করেন। নাতেক কলমের পাশে এবং ছামেত লাওহ বা ফলকের পাশে।[৪২]

পর্যালোচনা ও জবাব

ইসমাঈলীরা রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতে আলী (রাঃ)-কে ভাগীদার বানিয়েছে এবং মানমার্যাদাতে সমান গণ্য করেছে। যদি বিষয়টা এমনই হ'ত, তবে রাসূল (ছাঃ)-কে কেন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানবজাতির নিকট পাঠালেন সকলের রাসূল ঘোষণা করে?[৪৩]

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৪৪]

২. মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।[৪৫]

৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে পূর্ণ করে দিয়েছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছি।[৪৬]

৪. মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।[৪৭]

৫. মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৪৮]

(চলবে)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ']

---

৩৪. আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩; গৃহীত : নু'মান কাযী, আসাসুত তা'বীল, (বৈরূত: দারুছ ছাক্বাফাহ) পৃ. ২৯-৩০; শীরাজী, মাজালিসুল মুওয়াইইদ (বৈরূত : দারুল আন্দালুস) পৃ. ১/৩৪৯।

৩৫. তদেব, পৃ. ৪৭৪; গৃহীত : ইয়াকুব সিজিস্তানী, ওয়াল ইফতিখার, পৃ. ৭১।

৩৬. তদেব, পৃ. ৪৭৪; গৃহীত : কামেল হুসাইন, সিরাতু মুওয়াইইদ ফিদ্দীন, দারুল কিতাব মিছরী, পৃ. ১৭; জা'ফর ইবন মানছূও ইয়ামন (কায়রো : দারুল ফিকরুল আরাবী, প্রকাশক, নাশর শাতুরজান, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

৩৭. তদেব, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫।

৩৮. তদেব, পৃ. ৪৭৪।

৩৯. তদেব, পৃ. ৪৭৭; গৃহীত : রাহাতুল আকল, ২৭৫।

৪০. তদেব, পৃ. ৪৭৭; গৃহীত : কিতাবুল কাশফ, ৬৭।

৪১. তদেব, পৃ. ৪৭৭।

৪২. তদেব, পৃ. ৫৭৯; গৃহীত : নু'মান, আসাসুত তা'বীল, পৃ. ৪০-৪১।

৪৩. তদেব, পৃ. ৪৮০।

৪৪. সাবা ৩৪/২৭।

৪৫. আহযাব ৩৩/৪০।

৪৬. মায়েদা ৫/০৩।

৪৭. আ'রাফ, ৭/১৫৮।

৪৮. ইউসুফ, ১২/১০৮।

রোহিঙ্গাদের পর মিয়ানমার সামরিক জান্তার কবলে এবার কারা?

-শামসুল আলম

ভূমিকা :

'কথায় বলে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে'

এই লাইন দু'টির মূল ভাব হল, যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করল আর যদি অন্য মানুষ তা দেখে চুপ থাকে কিংবা সমর্থন করে তাহলে উভয়ই সমান অপরাধী। এর ফলাফল সকলকে ভোগ করতে হয়। এরই বাস্তব প্রমাণ সম্প্রতি আমাদের পার্শবর্তী দেশ মিয়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক এবার সে দেশেরই জনগণের উপর হত্যা, নির্যাতন ও বিতাড়নের লোমহর্ষক চিত্র, যারা সকলে মিলে একসময় রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল। সেই সময়ের প্রধান নরখাদক সিনিয়র জেনারেল হ্লাইং সেনা শাসনের মাধ্যমে সে দেশেরই এবার নিজ ঘরের সুসন্তানকে (?) বন্দী রেখে সাধারণ জনগণের উপর হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে দেশছাড়া করছে। রোহিঙ্গা মুসলিমরা আশ্রয় নিয়েছিল বাংলাদেশে। এবার সে দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ বিরোধী সাধারণ জনগণ আশ্রয় নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ড ও ভারতে।

নোবেল বিজয়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী অং সান সুচি যে আন্তর্জাতিক আদালত হেগে (নেদারল্যান্ড) কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখে বলেছিলেন তার দেশের সরকার ও সেনা প্রধানসহ কোন সামরিক সদস্য গণহত্যা কিংবা রোহিঙ্গা মুসলিম হত্যা নির্যাতনের সাথে জড়িত নয়। অথচ সেই সুচির দলের নিরঙ্কুশ বিজয় শেষে ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক ঘন্টা পূর্বে ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে নির্বাচনে কারচুপির দোহাই দিয়ে সে দেশের সামরিক জেনারেলরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। বন্দী করেছে হাযার হাযার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিরোধীমত পন্থীদের। শতশত নর-নারী হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সে দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুশী করার জন্য ও রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য যে রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করা হল, শেষমেষ সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভোটে পাশ করেও সুচী ক্ষমতার মুখ তো দূরের কথা আমানবিকভাবে এখন কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর, ভাগ্যের কেমন নির্মম পরিহাস, যেই জেনারেলদের পক্ষে সুচি মিথ্যা সাফাই গেয়েছিলেন সেই জেনারেলরাই তাকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

কেন এমনটা হল মিয়ানমারে। অতীত ইতিহাস কী বলে, একটি গরীব রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘাড়ে অবস্থানরত ১১ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের ভবিষ্যত কী, আর মিয়ানমারের ভবিষ্যতও বা কী হতে যাচ্ছে? মিয়ানমারের নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির চুলচেরা বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল।

মিয়ানমারের পিছনের কথা

মিয়ানমার দক্ষিণ এশিয়ার ৯টি দেশের একটি। ১৯৪৮ সালের ৪ই জানুয়ারী বৃটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে নতুন রাষ্ট্রীয় নাম হয় 'ইউনিয়ন অব মায়ানমার'। এর পূর্বে ১৯৪৫ সালে জার্মান-জাপানের পক্ষ হয়ে ইংল্যান্ড আমেরিকার মিত্র শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বৃটেনের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন হয়ে ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ২৬১২২৭ বর্গ মাইল আয়তনের সবুজ ফসল আর পাহাড়-পর্বতে ঘেরা, নানা খনিজ সম্পদে ভরা সাধারণ মানুষের এই দেশটি বেড়ে উঠেছে সেনা সমর্থিত রাজনীতির শাসন কাঠামোতে। বৃটিশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় অধ্যুষিত দেশটিতে সে সময় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকলে মিলে এক সাথে সংগ্রাম করেছিল। সে সময়ে বর্তমানের অংসান সুচির পিতা মিয়ানমারের জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা জেনারেল অং সান-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনেক মুসলিম নেতা পরবর্তীতে মায়ানমার তথা বার্মার (পূর্বনাম) মন্ত্রীপরিষদের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ৮৯%বৌদ্ধ, ৪% খৃষ্টান, ৪% মুসলমানের এই দেশটিতে সব ধর্মের মধ্যে একটা সম্প্রীতির পরিবেশ ছিল। তার গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল হ'ল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও মুসলিম আরাকান সাম্রাজ্য, যার অধীনে ছিল বাংলাদেশের অনুপম সৌন্দর্যের পর্যটন এলাকা কক্সবাজারও। সরেযমীনে দেখা যায় এখনও কক্সবাজার ও আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় একই। ইতিহাস বলে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে রাহমী নামক আরাকানী শাসকের নিকট এক কলস আদা হাদিয়া দেন। সে সময় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছাহাবীগণ এখানে এসেছিলেন। এরপর আরব বণিকগণ দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এসে চট্টলা (বর্তমান চট্টগ্রাম) সমুদ্র বন্দরে নৌকা, জাহায ভীড়ান। অত্র এলাকায় ইসলামের সুমহান দাওয়াতের পাশাপাশি তারা ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। তখন থেকে তারা বার্মার আরাকান রাজ্যসহ সারা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের সুমহান দাওয়াতের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে এবং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে ১২০৪ সালে বাংলা জয়ের মাধ্যমে ভারত

উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিক ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ জাতিগত বৈষম্য ও পরস্পর যুলুমের শিকারে পতিত সাধারণ মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। এজন্য দেখা যায় স্থানীয় শাসকগনের শাসন কাঠামো দুর্বল হয়ে মুসলিম শাসনের অগ্রযাত্রা চলতে থাকে। চার খলীফার আমলে ইসলামের প্রচার-প্রসারের পর মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক উপমহাদেশ শাসন চলতে থাকে। সে সময়ে আরাকান রাজ্যসহ উপমহাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমানরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করেন। অতঃপর দাঈগণ হিন্দু-বৌদ্ধ ছেলে-মেয়েদের ইসলামে দীক্ষিত করে বিয়ে-শাদী করে বসবাস করতে থাকেন। রোহিঙ্গা মুসলিম তাদেরই উত্তরসূরী।

অতঃপর ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে তাদের শোষন-নিপীড়ন অব্যাহত থাকলেও দেশীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ নীতিতে পাশাপাশি একত্রে সহমর্মিতা নিয়ে তারা ভালভাবেই বসবাস করতে থাকে। বড় রকমের কোন জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মারামারি-কাটাকাটি তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। অতঃপর ১৯৪৮ সালে বার্মা বৃটিশদের থেকে স্বাধীন হয় এবং একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের সামরিক শাখা, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী যারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তারাই আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুদিন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর উনের নেতৃত্বে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৮ সালে ক্ষমতাসীন এ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রিডম লীগ (AFPL)-এ ভাঙন দেখা দিলে জেনারেল নে উইন তৎকালীন সরকারকে সরিয়ে দিয়ে তার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পরে উনের নেতৃত্বে আবারও বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে আবার সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে দেশটিতে নতুন সংবিধান চালু হয়। এভাবে সেনারা দেশ চালাতে থাকে। ১৯৮৮ সালে অং সান সুচির নেতৃত্বে গঠন করা হয় ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসী (NLD)। ২৭শে মে ১৯৯০ সালে সাধারণ নির্বাচনে NLD ৪৯২টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে সেনা সমর্থিত রাজনৈতিক মিলিশিয়া ইউনিয়ন সলিডারিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (USDA) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৮ সালে সামরিক জান্তা নতুন সংবিধান অনুমোদন করে তাদের ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করেন। ৮ই জুন ২০২১ সালে (USDA) ইউনিয়ন সলিডারিটি এ্যান্ড ডেভেল্পমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন পার্টি (USDP) নাম ধারণ করেন। এ দলটিই সেনাবাহিনীর পোষা দল হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৫ই আগষ্ট ২০০৭ সাল থেকে শুরু করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সেদেশের জ্বালানী তেলের উপর ভতুর্কি তুলে নিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ হয় যা উষ্টাটাবেকা বা জাফরান বিপ্লব (Saffron Revulation) নামে পরিচিত। ৭ই নভেম্বর ২০১০ কথিত সাধারণ নির্বাচনে সেনা সমর্থিত (USDP) বিজয় দাবী করে। ততদিন অংসান সুচির নেতৃত্বে দেশে আবার রাজনৈতিক সুষম ক্ষেত্র তৈরী হয়। এ প্রেক্ষাপটে ১লা এপ্রিল ২০১২ সালে আইন সভার নির্বাচনে ৪৫টি আসনের মধ্যে ৪৩টি আসনে সুচির (NLD) প্রার্থীরা জয়লাভ করে এবং বহিঃর্বিশ্বের চাপে ৮ই নভেম্বর ২০১৫ সালে দেশটির সাধারণ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণে সুচির দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বিজয় লাভ করে। এখানে সেনারাও তাদের কতৃত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করে। আর এই সুযোগে ২৫শে আগষ্ট ২০১৭ সালে তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসী হামলার দোহাই দিয়ে নিরীহ মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর বর্বর হামলা, হত্যা, ধর্ষণ চালিয়ে তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। ৮ই নভেম্বর ২০২০ সালে দেশটিতে আইনসভা নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়া ৪৯৮টি আসনের মধ্যে ৩৯৬টি আসলে জয় লাভ করে ক্ষমতাসীন (NLD) এবং সেনা সমর্থিত (USDP) পায় মাত্র ৩৩ আসন। কিন্তু সেনারা পরাজয় স্বীকার করেনি। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেন। ২৯শে জানুয়ারী ২০২১ সালে সেনাবাহিনীর এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে নির্বাচন কমিশন তাদের অন্যায্য দাবী খারিজ করে দেন।

আবার সামরিক শাসনের কবলে মিয়ানমার

২০১৫ সালে দেশের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের মাধ্যমে সামরিক শাসকের পরোক্ষ সহযোগিতা নিয়ে সরকার গঠন করেছিল। সাধারণ জনগনের মৌলিক অধিকারগুলো অন্ধকার হতে আলোর পথ দেখাবে ভাবা হয়েছিল। এর পরপরই সুচির সর্মথক এবং সাধারণ জনগণ এর প্রতিবাদে মাঠে নামলে সেনাবাহিনী শক্ত হাতে দমনাভিযান শুরু করে। শতশত বার্মিজকে হত্যা করে এবং হাজার হাজার মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ড ও ভারতে আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক ভাষ্যমতে ধারণা করা হয় ৩রা জুলাই ২০২১ মিয়ানমারের বর্তমান সেনা প্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হবে। নিয়মানুসারে তাকে অবসরে যেতে হবে। দীর্ঘ বছর পর তার সে দেশের প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন ছিল। গত ৮ই নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সেনা শাসকেরা তাদের সমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (USAP) ব্যাপক ভরাডুবির ফলে তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে যায়। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের সংবিধানানুসারে সেনাদের মধ্য থেকে শতকরা ২৫ ভাগ সংসদ সদস্য রাখা হয়। হিসাবানুযায়ী সেনাদের জন্য মোট সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৬৬টি। মিন অং হ্লাইংয়ের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এর বাইরে আরো ১৬৭টি আসনের দরকার ছিল। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের বাইরে দলটি মাত্র ৩৩ আসন পায়। অপরদিকে সংরক্ষিত আসন ছাড়া সুচির NLD ৪৯৮টি আসনের মধ্যে

৩৯৬টি আসনে জয় পায়। এ অবস্থায় সেনাবাহিনী নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে মর্মে নির্বাচন কমিশনের ওপর অভিযোগ তোলে। এরপর সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। সেনা শাসকেরা দেখিয়ে দিল শুধু মুসলিম রোহিঙ্গা নয় ক্ষমতা দখলের জন্য নিজের ঘরের মানুষ কিংবা স্বজাতিকেও গ্রেফতার, হত্যা, নির্যাতন ও দেশত্যাগে তারা বাধ্য করতে পারে। অতঃপর ২রা ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ১১ সদস্য বিশিষ্ট (STATE ADMINISTRATION COUNCIL) সংক্ষেপে (SAC) গঠন করে বহাল তবিয়তে অবৈধ পন্থায় মিয়ানমারে একচ্ছত্র অধিকার প্রয়োগ করে স্বৈরচারী সামরিক সেনা শাসন পুনরায় চালু করে।

দীর্ঘ ৫০ বছরের সেনাশাসন ও রাজনীতি

মিয়ানমার এমন একটি বিচিত্র দেশ যেখানে দীর্ঘ ৫০ বছরাধিকাল থেকে সেনাশাসন চলে আসছে। পৃথিবীতে এমন

শাসন আর দেখা যায় না যে একটি দেশ সামরিক বাহিনী দ্বারা সার্বিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। প্রকৃতঅর্থে তাদের প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য দেশের প্রতিরক্ষা এবং বিদেশী শক্তি থেকে দেশ রক্ষা করা। বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধানে সোনবাহিনী সে শপথ নিয়েই তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করার কথা। কিন্তু না, উল্টা শপথ ভেঙ্গে দায়িত্বের প্রতি অবমাননার কারণে এখন তারা জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। যাইহোক ১৯৪৫ সালে মিয়ানমারে যে সামরিক বাহিনী গঠিত হয় তার নাম ছিল তাতমাতো (Tatmadaw)। এর তিনটি শাখা ছিল সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, যারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেনারেল অং সানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল। তাকেই সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেখা হয়। দেশটির স্বাধীনতার ৬ মাস আগে ১৯শে জুলাই ১৯৪৭ সালে তিনি প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হন। এরপর ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর উনের নেতৃত্বে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। আর ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ সাল থেকে জেনারেল নে উইন ছিলেন সেনাবাহিনীর কমান্ডার। ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৮ সালে ক্ষমতাসীন এ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপসস ফ্রিডম লীগ (AFPFL)-এ ভাঙন দেখা দিলে জেনারেল নে উইন তৎকালীন সরকারকে সরিয়ে দিলে তার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ২রা মার্চ ১৯৬২ সালে নে উইন বার্মা সোশালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি (BSPP) প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে একক সরকার হিসাবে ঘোষণা দেন। এর জন্য ১৯৭৪ সালে নে উইন নতুন সংবিধান কার্যকর করেন। ৯ই নভেম্বর ১৯৮১ সালে জেনারেল নে উইন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল সান ইউয়ের কাছে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ২৩শে জুলাই ১৯৮৮ সালে দেশের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা ও দুর্নীতি-অনিয়ম ও কতৃর্ত্ববাদী শাসনের প্রতিবাদে উক্ত পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। সামরিক শাসক জেনারেল থান সুয়ে ৩০শে মার্চ ২০১১ সালে পদত্যাগ করেন। এভাবে মিয়ানমারে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরাধিকাল সামরিক জেনারেলরা জবরদস্তিমূলক দেশ চালায়। আবার এর পুণরাবৃত্তি ঘটে ১লা ফেব্রুয়ারী ২০২১ সালে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে সামরিক শাসক দ্বারা প্রণীত সংবিধানানুযায়ী দেশটির পার্লামেন্ট সেনাবাহিনী কোটায় ২৫% সংসদ সদস্য রাখা হয়। শুধু তাই নয় দেশ পরিচালনা, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়সহ সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয় ছিল সেনাদের নিয়ন্ত্রণে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী যেহেতু পার্লামেন্ট এক-চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু যে কোন মৌলিক আইন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন পড়ে সামরিক আইন প্রণেতাদের। এভাবে মিয়ানমারে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের মাধ্যমে তারা যেমন গণমানুষের অধিকার সহ ধর্মীয় ও মানবিক সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তেমনি তার ধারাবাহিকতায়

স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা গং তাদের কথিত অহিংস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে মুসলিম রোহিঙ্গাদেরকে জাতিগত হত্যা-নিধন, দেশ বিতাড়নের কারণে বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে কালো অধ্যায় রচনা করে গেছে।

বর্তমান সেনাপ্রধান মিন হ্লাইংয়ের উত্থান

মিয়ানমারের স্বৈরাচারী সেনাপ্রধান মিন হ্লাইং-এর নাম বিশ্বব্যাপী যেমন পরিচিত, তেমনি সমালোচিত, নিন্দিত ও ধিকৃত। কারণ তিনিই রোহিঙ্গা মুসলিম গোষ্ঠীকে বর্বর হত্যা নিধনের জন্য মূল পরিচালনাকারী এবং তার সহযোগী ছিলেন কথিত নোবেল বিজয়ী স্টেট কাউন্সিলর অংসান সুচি এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। রক্তখেকো এই সেনাপ্রধানসহ আরো কয়েক জন সামরিক নেতার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই উচ্চাভিলাষী সামরিক নেতা ৩রা জুলাই ১৯৫৬ সালে মিয়ানমারের তাভয়ে (বর্তমান দাউই) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে পাশ করেন। তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে ডিফেন্স সার্ভিসেস একাডেমীতে যোগ দেন। ৩০শে মার্চ ২০১১ সালে তিনি সেনাপ্রধান হন। ২০১৬ সালে তিনি পুণরায় ৫ বছরের জন্য ক্ষমতা বাড়িয়ে নেন। এই সেনাপ্রধানের আমলে অর্থাৎ ২০১৭ সালেই মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যা নিযার্তন নতুন মাত্রা পায়। ফলে ২০১৯ সালে এই নেতাসহ ৩ জন সামরিক নেতার বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক আদালতে জাতিগত হত্যা ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন দেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তিনিই আবার ১লা ফেব্রুয়ারী ২০২১ সালে অবৈধভাবে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে এবং নির্বাচিত নেতা অং সান সুচিকে গ্রেফতার করে ক্ষমতা দখল করেন।

সুচির উত্থান-পতন

বৃটেন থেকে মিয়ানমারকে স্বাধীন করার নায়ক জেনারেল অং সানের মেয়ে হলেন অং সান সুচি। তিনি ১৯শে জুন ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার জন্য বৃটেনে যান। পড়ালেখা শেষ করে সেখানে বেশকিছু দিন কাটানোর পর ১৯৮৮ সালে দেশে ফিরেন। তিনি দেশের মানুষের পক্ষে অধিকার আদায়ের জন্য সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। এজন্য ১৯৮৯-২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ১৫ বছর যাবৎ গৃহবন্দি ছিলেন। গৃহবন্দি থাকাকালে তিনি ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। ৮ই নভেম্বর ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সুচির দল NLD নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। তবে স্বামী ও সন্তানেরা বিদেশী নাগরিক হওয়ায় সেনা সমর্থিত সংবিধান অনুযায়ী তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। সরকারের স্টেট উপদেষ্টা থাকাকালে ২০১৭ সালে রাখাইনে দেশের রোহিঙ্গা মুসলিমের উপর খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন ও জোরপূর্বক দেশ ত্যাগে বাধ্য করার সময়ে সুচি উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সেনাদের সমর্থন দেন। ফলে তিনি বহির্বিশ্বে ব্যাপক সমালোচিত, ধিকৃত ও নিন্দিত হন। এমনকি আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় স্বৈরাচারী সামরিক শাসকদেরকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সাফাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেন যে তার দেশের সরকার ও সেনারা কোন রোহিঙ্গা গণহত্যার সাথে জড়িত নয়। আজ সে মিথ্যা সাক্ষ্যের জের পাচ্ছেন সুচি। তাকে নির্মমভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার পাশাপাশি তার দলের লোকজনকে গ্রেফতার, হত্যা ও নির্যাতন অতঃপর দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এভাবেই ইতিহাসের নির্মম পালাবদলের সাক্ষী হতে হচ্ছে তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে।

মিয়ানমারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত

মিয়ানমারে বিগত কয়েক মাসে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ হত্যা করা হয়েছে। নানা রকম নির্যাতনসহ প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট, সুচি সহ তাঁর হাযার হাযার নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কয়েক হাযার মানুষ সেনা অত্যাচারের কারণে থাইল্যান্ড ও ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিবাদকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরও গুলি চালিয়ে হত্যা, নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সামরিক জান্তার সরকার পতনের জন্য ও সুচির মুক্তির জন্য দেশটির রাজধানী নেইপিদো, ইয়াঙ্গুন, মান্দালয় ও বড় বড় শহরসহ সারাদেশে উত্তাল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। যা সেনাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসব ডামাডোলের মধ্যে পার্শ্ববর্তী চীন, রাশিয়া এবং ভারতের রহস্যাবৃত ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বৃটিশ ওপেন সোর্স প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, সামরিকজান্তা বিরোধীদের দমনের জন্য চীনের তৈরী চালকবিহীন আকাশযান (ইউএভি) ড্রোন ব্যবহার করছে। রাশিয়ার তৈরী ডিজিটাল নজরদারির সিস্টেম, যন্ত্রপাতি এবং মডেলের ফাইটার জেট দিয়েছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, বিরোধীমত দমনে ব্যবহৃত ভেহিক্যালগুলোর মালিক চীন। এই চীন ও রাশিয়া রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতনে ও সমর্থন জুগিয়েছিল যাতে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় তুলেছিল। এমনকি তারা গত ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৯ জাতিসংঘে উত্থাপিত মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনতেও বাধা দিয়েছিল। চীন তার দেশে উইঘুর মুসলিমদের উপরও একই কায়দায় নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। এগুলো সকলের ভাবনার ব্যাপার। কিন্তু তাদের এসব অন্যায় সহযোগিতা কোন সভ্য মানুষের কাছে কাম্য নয়। তবে এজন্য মিয়ানমারে চীনের তৈরী শিল্প কলকারখানার উপর আন্দোলনকারীরা হামলা চালিয়েছে এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে ভারত চুপচাপ বসে সামরিক জান্তাকে তার স্বার্থে মৌন সমর্থন দিয়ে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যাইহোক এই মুহূর্তে সুচি ও তার দলের বুঝা উচিত মুসলিম রোহিঙ্গাদের হত্যা ও বিতাড়নকে সমর্থন করা তাদের জন্য আদৌ ঠিক হয়নি। মিয়ানমারে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে এখনই তাদের উচিৎ হবে রোহিঙ্গাসহ মিয়ানমারের সকল জাতি-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ডাক দেয়া, যাতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে। সামরিক শাসনের জাতাকল থেকে

মিয়ানমার স্থায়ীভাবে মুক্তি পায়। তবে সুচি ও তার দল কি সেই সৎসাহস রাখে?

মুসলিম রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত

মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষে শরণার্থী শিবিরে লাখ লাখ মুসলিম রোহিঙ্গাদের অমানবিকভাবে সে দেশের নরপশু সেনাদের নযরদারিতে কোন রকম বেঁচে আছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৩ লাখ মুসলিম রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসাবে অবস্থান করছে। গত ২০-২২শে ডিসেম্বর ২০১৬ এবং ২য় বারে ১-৪ জানুয়ারী ২০১৭ মোট ১সপ্তাহ কক্সবাজারের বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবির যেমন: রামু, টেকনাফ, উখিয়া এবং কক্সবাজার শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে রামু, নাইক্ষংছড়ির প্রায় ১৫০-২০০ ফুট উঁচু পাহাড়-পর্বতে প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে আছে। রোহিঙ্গাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতে সবকিছু বিস্তারিত জানার সুযোগ হয়েছিল সেই সময়। প্রায় শত শরণার্থীর সাক্ষাতকারে জানা গিয়েছিল তাদের দেশ মিয়ানমারে সেনা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সীমাহীন অত্যাচারের নির্মম কাহিনীর কথা। ওদের ভাষায় কাফিররা তাদের সব শেষ করে দিয়েছে ও তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ ফেলে রেখে আসতে বাধ্য করেছে। আমরা স্বামী কিংবা স্ত্রী অথবা কন্যা সন্তানদের মৃত লাশ অথবা হারানো অবস্থায় রেখে পালিয়ে এসেছি। আমরা দেশত্যাগের সময় কয়েকদিন পায়ে হেটে অথবা নাফ নদী পার হয়ে কয়েকদিন না খেয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছি। কারও কারও ৫ থেকে ৫০ হাযার টাকাও দিতে হয়েছে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী ও তাদের দালালদের হাতে। হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, আগুনে পুড়িয়ে মারা সহ তাদের উপর নির্মম নির্যাতনের কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের চোখের পানি চলে আসে। গা শিহরিত হয়ে উঠে। সভ্যতার এই যুগে মানুষ এত বর্বর, নিষ্ঠুর ও অমানবিক হতে পারে! যেন ফেরাউনী শাসনকেও হার মানিয়ে যায়। সবমিলিয়ে বর্তমানে প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এরমধ্যে শেখ হাসিনা সরকার ভাষানটেকে কয়েক হাযার শরণার্থীকে পুর্নবাসন করেছে। বাংলাদেশ এদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়ে প্রশংসা পেয়েছে। তবে সরকারকে আরও উদ্যোগী হয়ে এবং আন্তর্জাতিক মহলে দৌড়-ঝাপ করে তাদেরকে নিজ বাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ওআইসি, আরবলীগ, আসিয়ানসহ বিশ্বসম্প্রদায়কে সচেতন করতে হবে। এদের প্রামাণ্য চিত্র বিশ্বসম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করতে হবে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতে দোষীদের প্রকাশ্যে বিচার ও গ্রেফতার করার জন্য সভা-সমাবেশ করতে হবে। যাতে এই বিপন্ন জনগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পায় এবং অতি দ্রুত নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক আদালতের ভূমিকা

ধন্যবাদ দিতে হয় আফ্রিকার ছোট একটি দেশ গাম্বিয়ার সরকারকে যারা অত্যন্ত সময়োপোযোগী ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নেদারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করে এবং মামলার কার্যক্রমকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়। মিয়ানমার সরকারকে গণহত্যার দায়ে আদালত ২০ জানুয়ারী ২০২০ এক অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেন ICJ -এর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুল কোয়াই আহমদ ইউসুফ। তাতে চার দফা নির্দেশনা দেয়া হয় মিয়ানমারকে। সর্বসম্মতিক্রমে এই আদেশে বলা হয়-

(ক) গণহত্যা সনদ অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের হত্যাসহ সব ধরনের নিপীড়ন থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে।

(খ) সেনাবাহিনী বা অন্য কেউ যাতে গণহত্যা সংগঠন ষড়যন্ত্র বা উস্কানী দিতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) গণহত্যার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সব সাক্ষ্য প্রমাণ রক্ষা করতে হবে।

(ঘ) চার মাসের মধ্যে আদেশ অনুযায়ী মিয়ানমার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে তা আদালতকে জানাতে হবে।

নিঃসন্দেহে এ আদেশ রোহিঙ্গা সহ সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি ইতিবাচক ঘটনা। এখন সুচি সহ মিয়ানমারের মুক্তিকামী জনগণের উচিৎ হবে তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে এসে সামরিক জান্তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের এই আদেশ দ্রুত পালনের জন্য সহযোগিতা করা। কারণ তাদের বুঝা উচিত ঘরে বিষধর সাপ পুষে কখনও নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবা যায় না। জীবন বাজি রেখে হলেও জনগণের এ অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাদেরকে থাকতে হবে। তবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে, নতুবা নয়।

উপসংহার

পরিশেষে নিপীড়িত মুসলিম রোহিঙ্গাদের বুঝা দরকার যে, তারা যেখানেই থাকুক তাদের সকলকে শিক্ষা-দিক্ষা ও দ্বীনী জ্ঞানার্জনে রত থাকতে হবে। সুষ্ঠু ও দ্বীনী সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। কারো কোন উস্কানীতে কান না দিয়ে ধৈর্যের সাথে মহান আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য ও করুণা প্রার্থনা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও সুচির সরকার বিগত দিনগুলোতে রোহিঙ্গাদের উপর যে নির্যাতন-নিপীড়নের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, তা যেন ফেরআউনী দুঃশাসনকেও হার মানিয়েছে। যদি তাওহীদপন্থী মযলুম জনতা মহান অভিভাবক আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা ও ছবর করতে পারে, তবে বিশ্ববাসী আরো একবার ফেরআউনী ধ্বংসলীলার ইতিহাস নিজ চোখে দেখে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সেইদিনের অপেক্ষায়। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য মযলুম জনতাকে আল্লাহ সঠিক পথের দিশা দিন এবং তাদের হিফাযত করুন- আমীন!

[লেখক : সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী]

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ

*[মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (৬৫) কুমিল্লা যেলার একজন কৃতী আলেম ও সংগঠক। শিক্ষকতার সুবাদে তিনি যেমন বহু ছাত্র তৈরী করেছেন, তেমনি সাংগঠনিক জীবনে অসংখ্য মানুষের দীক্ষাগুরু হয়েছেন। জীবনের শুরুকাল থেকেই একজন সচেতন, মুখলিছ ও হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি সমাজের সমস্যাগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ডাক পাওয়ার পর আর দেরী করেননি। দৃঢ় প্রত্যয়ে হাতে তুলে নিয়েছেন সমাজ সংস্কারের মহান দায়িত্ব। বলিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়ে তিনি নিজ যেলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঝাণ্ডাকে উচ্চকিত করেছেন বহুদূর সীমানায়। বৃহত্তর কুমিল্লাসহ দেশে-বিদেশে তাঁর রয়েছে অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী। সংগ্রামী এই মানুষটির কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন **আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক**- নির্বাহী সম্পাদক]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : আমার জন্ম ১৯৫৬ সালে, কুমিল্লা যেলার বুড়িচং উপযেলার জগৎপুর গ্রামে। আমার পিতা মাওলানা আব্দুল হামীদ। দাদা মুন্সী আব্দুল জব্বার এবং পরদাদা আরব মিয়াঁ। পরদাদা আরব মিয়াঁ ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসায় পড়াশুনা শেষে আমার আব্বা দিল্লীতে যান। দিল্লীতে পড়াশুনা শেষ করে এসে তিনি গ্রামের মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে অসুস্থতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং জগৎপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের আমৃত্যু ইমাম ও খতীব ছিলেন। আমার পরদাদা আরব মিয়াঁ অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। এজন্য তাকে মিয়াঁ ছাহেব বলা হ'ত। তিনি প্রথম জীবনে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে আহলেহাদীছ হন। আমীরে জামা'আতের থিসিসে (পৃঃ ৪২১) উল্লেখিত গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ্র (ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ) মেয়ের সাথে আমার পরদাদা আরব মিয়াঁর দ্বিতীয় পুত্র আফতাবুদ্দীন মুন্সীর বিবাহ হয়। ফলে বংশ পরম্পরায় ছোট থেকেই আমি দ্বীনী এবং ইলমী পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছি, *আলহামদুলিল্লাহ*।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : জগৎপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর কুরআন হিফয শুরু করি। পরবর্তীতে হিফয অসম্পূর্ণ রেখে জগৎপুর ফাযিল মদ্রাসায় ভর্তি হই। এখানে ফাযিল পর্যন্ত লেখাপড়া করি। মাঝখানে আলিম পরীক্ষার পর আমার উস্তায মাওলানা আব্দুল হাকীম আমাকে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পার্শ্ববর্তী কাসেমুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি করান। কিন্তু সেখানে আহলেহাদীছ তরীকায় আমল করা যায়না বিধায় ঈদুল আযহার পঁচিশ দিন পূর্বে বাড়ি চলে আসি। ঈদের পর আমার আব্বা আমাকে ঢাকা নাযিরাবাজার মাদ্রাসাতুল হাদীছে ভর্তি করান। সেখানে আরবী সাহিত্য, হাদীছ, তাফসীর, বালাগাত প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করি। এর পাশাপাশি আমার উস্তায অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ-এর কাছে মাক্বামাতে হারীরী অধ্যয়ন করি। তাছাড়া ১৯৭৯ সালে কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল এবং ১৯৮১ সালে মুরাদনগর সোনাকান্দী মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করি।

তাওহীদের ডাক : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কোন উল্লেখযোগ্য স্মৃতি আপনার মনে আছে কি?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : ১৯৭১ সালের স্মৃতি আমার ভালেভাবেই মনে আছে। আমাদের গ্রাম পূর্ব থেকেই আহলেহাদীছ হওয়ায় শত্রুতাবশত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ময়নামতি সেনানিবাসে আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হয়। সেকারণে ৫ই মে ১৯৭১ সালে প্রায় ৫/৭ শো হানাদার বাহিনী আমাদের গ্রামের দিকে রওনা দেয়। গ্রামের ৪ কি.মি. পশ্চিমে মালাপাড়ায় তারা মুক্তিবাহিনী কর্তৃক বাধার শিকার হয়। ফলে তারা সেখানে নির্মমভাবে অনেক গ্রামবাসীকে হত্যা করে। অতঃপর আমাদের গ্রামে আসে। তাদের আগমনের খবর পেয়ে আব্বার সাথে বাড়ির দক্ষিণ পাশে আসি। এত অস্ত্র-শস্ত্র আর এমন সেনাবাহিনী আগে কখনো দেখিনি। আমাদের বাড়িতে তখন অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। আব্বার সাথে উর্দূতে তাদের অনেক কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তারা তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশি শেষে আমার মাথায় ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের সাথে নিয়ে যায়।

কিছুদূর যাওয়ার পর বললাম, যিয়াদা তাকলীফ হো রাহী হ্যায়। এটা শুনে তারা আমাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু ৫ মিনিট পর ফিরে এসে আব্বার দিকে অস্ত্র তাক করে বলতে লাগল তোমার ছেলে কোথায়? তোমার ছেলে (আমার বড় ভাই) মুক্তিফৌজ। আব্বার নির্দেশে এই ভয়ংকর মুহূর্তে আমরা কেবল দো'আ ইউনুস পড়ছিলাম। আব্বা তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। ইতিমধ্যে তারা আমাদের পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমাদের মোল্লা বাড়িতে যখন আগুন দিবে, তখন হুইসেল বেজে ওঠায় তারা আগুন না লাগিয়ে চলে যায়।

তাওহীদের ডাক : আপনার পেশাজীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : ১৯৭৭ সালে আমি শিক্ষক হিসাবে আমার গ্রামের জগৎপুর মাদ্রাসায় যোগদান করি। সেসময় উক্ত মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল আমার উস্তায মাওলানা আব্দুল হাকীম এর সাথে গ্রামবাসীর ঝামেলা চলছিল। এহেন মুহূর্তে মাদ্রাসায় থাকা না থাকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি আমার সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন। তিনি এটাও জানালেন যে, তিনি যদি মাদ্রাসায় না থাকেন তাহলে তাকে নতুন একটা মাদ্রাসা করতে হবে। তখন আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম যে, ১৯৭৪ সালে বন্যার সময় আপনার সাথে কোরপাই কাকিয়ারচরে মাওলানা আহসানুল্লাহ ছাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার ছাত্র শাহজাহান, শরাফাত আলী ও এরশাদুল্লাহকে সাথে নিয়ে কোরপাই বাজারের দিকে ঘুরতে যাই। বিশ্বরোডের পাশে ঐ আহলেহাদীছ এলাকাটা খুবই উর্বর এবং উপযোগী। সেখানে একটি মাদ্রাসা হলে সুন্দর হত। আমার পরামর্শ শুনে তিনি জগৎপুর মাদ্রাসা থেকে রিজাইন দিয়ে কোরপাই চলে যান এবং সেখানে এক সাথে প্রথম শ্রেণী থেকে ফাযিল পর্যন্ত মাদ্রাসা চালু করেন। এই মাদ্রাসার শুরু থেকে সরকারী মঞ্জুরী লাভ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আমাকে ভূমিকা রাখতে হয়েছে। উস্তায এবং মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করতে গিয়ে সেখানে হেড মাওলানা পদে শিক্ষকতাও করতে হয়েছে।

আরেকটা ঘটনা বলি, আমাদের প্রচেষ্টায় যখন বৃহত্তর কুমিল্লায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছড়িয়ে পড়ে, তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার বাঞ্ছারামপুর উপযেলার রাধানগর-কালিকাপুর গ্রামে আমরা একটা মাদরাসার জায়গা পরিদর্শনে যাই। মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী, মাওলানা মুছলেহুদ্দীনসহ আমরা কয়েকজন সেখানে গিয়েছিলাম। রাতের অন্ধকারে নৌকা যোগে আমরা জায়গাটি পরিদর্শন করি। কেননা সেখানে তখন হাঁটুর উপর পানি ছিল। পরবর্তীতে সেখানে আমাদের উদ্যোগে দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটি বর্তমানে আমাদের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে আলহামদুলিল্লাহ কুমিল্লায় আরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে। যেগুলি চলছে, ইনশাআল্লাহ চলবে।

সর্বশেষ জগৎপুর ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা থেকেই ৪৩ বছরের শিক্ষকতা জীবন শেষে উপাধ্যক্ষ পদ থেকে ২০২০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী অবসর গ্রহণ করি।

তাওহীদের ডাক : সংগঠনে কবে ও কিভাবে যোগদান করলেন?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি প্রথমে তাবলীগ জামাতের সাথে যুক্ত হই। আমরা আহলেহাদীছ ছিলাম। আমার আব্বা আলেম ছিলেন। তাই তাদের কিতাবাদি পড়ে ও বক্তব্য শুনে বুঝতে পারি সেখানে শিরক-বিদ'আতের ছড়াছড়ি। এজন্য শীঘ্রই তাবলীগ জামাত ছেড়ে দেই। অতঃপর আহলেহাদীছদের কোন যুব সংগঠন না থাকায় তৎকালীন প্রচলিত ইসলামী ছাত্র সংগঠনে যোগদান করি। ছাত্র সংগঠনে যোগ দিয়ে ঐ সংগঠনের উচ্চতর দায়িত্বশীল পর্যায়ে চলে যাই। তবে যখনই তাদের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বিরোধী কোনো কার্যকলাপ দেখতাম, তখন তা নোট করে নিতাম। এরপর যখন তাদের মুরব্বী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসি, তখন বুঝতে পারি এদের মধ্যে যথেষ্ট মাযহাবী গোঁড়ামি রয়েছে এবং এরা জাহেলিয়াতের সাথে আঁতাত করে চলছে। কুমিল্লা বার লাইব্রেরীতে তাদের কেন্দ্রীয় নেতার সাথে মতবিনিময় সভা চলছিল। ঐ সভায় কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রশ্ন করলাম, ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে যদি দেশে ইসলাম কায়েম হয়, তাহলে সেখানে কি কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক ইসলাম চলবে (আমি তখনও ছহীহ হাদীছ পরিভাষার সাথে পরিচিত ছিলাম না)? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন দেশে যে মাযহাবের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সে মাযহাব অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তাদের মাযহাব প্রীতি, আহলেহাদীছ বিদ্বেষ এবং জাহেলিয়াতের সাথে আঁতাতের বিষয়গুলি বুঝতে পেরে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলাম।

তখন বৃহত্তর পরিসরে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ভাবতাম আহলেহাদীছ মাসলাক কতিপয় আমল ও মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক দিকটা আমাকে অন্য সংগঠনের মাধ্যমেই চালাতে হবে। অতঃপর ১৯৮৪ সালে ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার মসজিদে ২১শে মে থেকে জমঈয়তের ১৫দিন ব্যাপী ইমাম প্রশিক্ষণ হয়। সেখানে কুমিল্লা যেলা থেকে আমাকে এবং মাওলানা অলিউল্লাহকে মনোনীত করা হয়। সেখানে আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আহলেহাদীছ আন্দোলন বিষয়ে কয়েকটা প্রশিক্ষণ দেন। যার নোট এখনো আমার কাছে আছে। প্রশিক্ষণে ওনার বক্তব্য শুনে আমি স্বস্তি ফিরে পাই। আমার কাছে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্যও বুঝে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে আমি আর প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনে জড়িত হব না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর আমীরে জামা'আতের সাথে কথা বলে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে' আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করি। পরে একই সালের ৮.৮.১৯৮৪ ইং তারিখে অনুমোদিত 'কর্মী' হই। আমীরে জামাআ'তের স্বাক্ষরিত উক্ত 'কর্মী অনুমোদন ফরম' আজও আমার কাছে অতি সযতনে সংরক্ষিত আছে। কেন্দ্রেও কপিটি সংরক্ষিত আছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং কিছু স্মৃতিচারণ যদি করতেন?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : আমি যখন প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন করেছি তখনও পরিস্থিতি প্রতিকূলে ছিল। নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করেছি। কর্মীদেরকে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। এরপর যখন আহলেহাদীছ আন্দোলনে আসি এবং কুমিল্লাতে সর্বপ্রথম 'যুবসংঘে'র কাজ শুরু করি, তখনও প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল। দাওয়াতী কাজ শুরুর পর আমার সঙ্গী-সাথীরাই বলতে লাগল, আমি এতদিন ঐ

সংগঠনের কথা বলেছি, এখন কেন অন্য সংগঠন করতে বলছি। ইঞ্জিনিয়ার রুস্তম আলীর বাসায় উক্ত সংগঠনের উপযেলা দায়িত্বশীলদের মিটিং ডাকলাম। অতঃপর বক্তৃতা দিয়ে বললাম, আমি যেহেতু আল্লাহ্র জন্য কাজ করব, সেহেতু আমার এক ফোঁটা রক্ত এবং আমার একটা পয়সাও আল্লাহ্র রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় ব্যয় হৌক, এটা আমি চাইনা। প্রচলিত ইসলামী সংগঠনের আদর্শিক ভিত্তির দুর্বলতা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের সামনে তুলে ধরলাম। তারাও বিষয়গুলো বুঝতে পারে। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সামনে বললাম, আমি আজ থেকে আর এই সংগঠন করতে পারব না।

তখন ইঞ্জিনিয়ার রুস্তম আলী, মৌলবী শামসুল হক, মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাওলানা আব্দুল জলীল প্রমুখও আমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন এবং আহলেহাদীছ 'যুবসংঘে'র সাথে কাজ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন আহলেহাদীছ যুবকরা বিভিন্ন মাযহাবী এবং অনৈসলামিক সংগঠনে জড়িত ছিল। গোটা যেলাতে আমরা যুবকদের পিছনে শ্রম দেই। আলহামদুলিল্লাহ সেই পরিশ্রমের বরকত আল্লাহ দিয়েছেন। যেলাব্যাপী আমরা সংগঠন করতে পেরেছি। সাংগঠনিক কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছি যে, এর জন্য বেশ কিছু বিষয় থাকা যরূরী- (১) আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। (২) আন্দোলনের প্রতি নিখাদ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকতে হবে। (৩) এই আন্দোলনকে পরকালীন নাজাতের অসীলা মনে করে কাজ করতে হবে। তবেই ময়দানে টিকে থাকা যাবে।

কর্মীরা কিছুদিন পর পর ঝিমিয়ে যায়। অধৈর্য না হয়ে তাদের পিছনে শ্রম দেই। তারা আবার চাঙ্গা হয়। এ আন্দোলন করতে গিয়ে ঘরে-বাইরে হামলার শিকার হয়েছি। সকল স্মৃতি তো বলা সম্ভব নয়। তবে দু'টি ঘটনা বলি-

(১) ১৯৮৭ সালে দাউদকান্দির মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়ার বাড়ির পাশে কামারকান্দিতে সাংগঠনিক প্রোগ্রামে যাই। সেখানে মাহফিলও ছিল। অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ ছিলেন সভাপতি। বক্তা হিসাবে ছিলেন আমার শ্বশুর মাওলানা আব্দুর রায্যাক, আমি আর আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। আমি বক্তব্য দিয়ে মসজিদে চলে আসি। এমন সময় মাযহাবীরা মাহফিলে চতুর্দিক থেকে হামলা শুরু করে। এক পর্যায়ে আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল একটা ছড়ি হাতে নিয়ে দৌড়ে মঞ্চে চলে যান এবং শ্লোগান দেওয়া শুরু করেন। শ্লোগান অবস্থায় মারামারি বন্ধ থাকে। শ্লোগান শেষ হলে আবার মারামারি শুরু হয়। এভাবে রাত প্রায় ১-টা বেজে যায়। আর এদিকে শত্রুরা মসজিদে আমাদের ঘেরাও করে রাখে। ওরা চর এলাকার ডাকাত স্বভাবের মানুষ। আমাদেরকে বস্তায় ঢুকিয়ে ফেলবে বলে হুমকি দিচ্ছিল। এই কঠিন অবস্থায়ও ওরা আমাদেরকে কিছু করতে পারেনি। পরিশেষে 'যুবসংঘে'র কর্মী আর স্থানীয় আহলেহাদীছদের প্রতিরোধে তারা চলে যায়। তারপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাহফিল শেষ হয় এবং ফজর পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলে।

পরদিন ওদের সাথে বাহাছ হবার কথা। অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ এবং শ্বশুর মাওলানা আব্দুর রায্যাক ছাহেব আমাকে এবং আমানুল্লাহ মাদানীকে বাহাছ করার দায়িত্ব দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। বাহাছের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু প্রতিপক্ষের আলেমদের কাউকে আর বাহাছের জন্য পাওয়া যায়নি। অতঃপর সেখানে সালিশী বৈঠক হয় এবং মাযহাবীরা আমাদের কাছে ক্ষমা চায়।

(২) ১৯৯১ সালে দেবিদ্বার থানার ফুলতলীতে যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চলছিল। ফুলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আমরা এশার ছালাত আদায় করি এবং বুঝতে পারি যে, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে। আমরা তা আঁচ করতে পেরে চলে যাই আব্দুল হাকীম চেয়ারম্যানের বাড়িতে। চেয়ারম্যানের ছেলে মু'আয্যাম হোসেন ছিল আমাদের দায়িত্বশীল। জমঈয়ত নামধারী কিছু লোক রাস্তায় আমাদের উপর হামলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা একে কিছু মনে করিনি। কর্মীদের রাতভর সতর্ক প্রহরার মধ্যে আমাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে বাইরে থেকে কিছু লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করলে তারই ভাইয়ের সাথে তার ঝামেলা বেঁধে যায়। কারণ ঐ লোকের ভাই ছিল আমাদের 'কর্মী'। এ ঘটনার পর গ্রামের সরদাররা আসতে শুরু করে। আব্দুল মতীন নামক একজন আমাকে চিনতে পারে। তখন সে বলেই ফেলে, আমরা তো ভাবছিলাম আজকে এখানে খুনাখুনি হবে। যাক আপনি যেহেতু পরিচিত, আশা করি আর কিছু হবে না। তখন আমি বললাম, হ্যাঁ! কেউ খুন হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্যই তো আপনি এসেছেন। তখন সে লজ্জা পেয়ে যায়। আমাদের প্রোগ্রাম জুম'আ পর্যন্ত চলবে। কিন্তু তারা আমাদেরকে আহলেহাদীছ মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করতে নিষেধ করল। বলল আমরা যেন হানাফী মসজিদে গিয়ে ছালাত পড়ি। আমরা বললাম তাহ'লে আমরা চেয়ারম্যানের বাড়িতে জুম'আর ছালাত পড়ব। তখন তারা লোকলজ্জার ভয়ে বলল, ঠিক আছে আপনারা জুম'আর ছালাত পড়তে পারেন। তবে আপনাদের কেউ খুৎবা দিতে পারবেন না। আমরা তাদের প্রস্তাবে রাযী হলাম।

ইতিপূর্বে পাশ্ববর্তী দেবীদ্বার থানার ভৈষেরকুট গ্রামে মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর আগমনে জমঈয়তের সম্মেলন হয়। সেখানে আমাদের দু'জন কর্মী ফয়যুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ শরীফ 'যুবসংঘ' করার অপরাধে (?) প্রহৃত হয়। পরের দিন চেয়ারম্যান আব্দুল বারী পুনরায় লোকজন নিয়ে তাদের উপর চড়াও হন ও তাদেরকে কঠিনভাবে যখম করেন। ফয়যুল ইসলাম এখন সিলেট সেনগ্রাম মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল এবং সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি। ভৈষেরকুটের আরেক কর্মী জসীমুদ্দীনকে দাড়ি রাখার অপরাধে তার বাপ-মা খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং এস.এস.সি পরীক্ষার ফরম ফিলআপের টাকা বন্ধ করেন। এধরণের বহু নির্যাতন ভোগ করেছে আমাদের কর্মীরা। সবার ইতিহাস এখানে বলা সম্ভব না।

আমাদের কর্মীদের আনুগত্য ছিল, ধৈর্য ছিল। তারা আমাদের নির্দেশনা মেনে চলে। যার কারণে আমরা পরাজিত হইনি। ফলে যারা এক সময় আমাদের সাথে রূঢ় আচরণ করেছিলেন, অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ ছাহেবের পা ভাঙ্গার হুমকি দিয়েছিলেন, আমাদের উত্তম আচরণে তারাই এখন আমাদের সাথী ভাই। সেই গ্রামের মসজিদ, মাদরাসা, বাৎসরিক ওয়ায মাহফিল কোনকিছুই এখন পূর্ণতা পায় না আমাদের ছাড়া। সাংগঠনিক জীবনে এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে, যেগুলি আমরা কাজে লাগিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাংগঠনিক তৎপরতা দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে।

তাওহীদের ডাক : আপনি যখন দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, তখনকার অবস্থা কেমন ছিল?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : ১৯৮৪ সালে যাত্রাবাড়ির ইমাম প্রশিক্ষণে গিয়ে 'যুবসংঘে'র সদস্য হয়ে বাড়ি ফিরি। তারপর আমি প্রথমে বৃহত্তর কুমিল্লায় আহলেহাদীছ অঞ্চল সমূহের একটি তালিকা তৈরী করি। সেই টার্গেটে কাজ শুরু করায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। চিহ্নিত কয়েকটি মাসআলা-মাসায়েল ও আমল ছাড়া তৎকালীন আহলেহাদীছ সমাজ নাম সর্বস্ব বৈ কিছুই ছিল না। আহলেহাদীছ যুবকরা তখন বিভিন্ন মাযহাবী ও বিজাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল। তখন দাওয়াতী কাজে তথাকথিত এসব ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হই। তবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' হ'ল নদীর উজান স্রোতের মতো। যতই বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই তা যোরদার হয়। আমাদের প্রচেষ্টার বাস্তব ফল হিসাবে ১৯৮৫ সালের ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর রামপুরে প্রথম যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন আমাকে আহ্বায়ক ও মাওলানা শরাফত আলীকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার নেতৃত্বে সমাজ সংস্কার এবং জনকল্যাণমূলক কিছু কাজের উদাহরণ যদি উল্লেখ করতেন!

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : আমি প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের পর থেকে সাংগঠনিকভাবে সমাজে পুঞ্জীভূত বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আত উৎখাতে ব্রতী হই। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা রহম করেছেন। যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় যেসব কাজ আমার দ্বারা আল্লাহ করিয়ে নিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- (১) পীর-ফকীরের আস্তানা উৎখাত করেছি। (২) ওরস ও বিদ'আতী যিকিরের হালকা বন্ধ করেছি। (৩) শবেবরাত ও শবে মে'রাজের নামে চালু বিদ'আতসমূহ বন্ধ করেছি। (৪) শবীনা খতম (৫) কুরআন খতম (৬) দল বেঁধে কবর যিয়ারত (৭) মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন দিনা, চার দিনা, চল্লিশা নামক যিয়াফত বন্ধ করেছি। (৮) খতমে ইউনুস। (৯) মদ, জুয়া ও যাত্রার আসরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। যেমন কোরপাই বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে মাযার উৎখাত করা হয়েছে। জগৎপুরে কবরের উপর আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে আখড়া বানানোর চেষ্টা করা হলে জনসম্মুখে নিজ হাতে কোদাল দিয়ে তা সমান করে দেই। (১০) পহেলা বৈশাখে জুয়াড়িদের বিপক্ষে বুড়িচং বাজারে মিছিল করা এবং আমাদের গ্রামের কেউ যাতে মেলায় যেতে না পারে সেজন্য কর্মীদের নিয়ে রাতভর গ্রামের সীমানা পাহারা দিয়েছি। সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আত ও বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ উৎখাতে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! এসব কাজে বৃহদাংশেই সফল হয়েছি। তাছাড়া জনকল্যাণমূলক কাজে বৃহত্তর কুমিল্লা যেলায় সাংগঠনিকভাবে তাওহীদ ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০-এর অধিক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে ট্রাস্টের অর্থায়নে মাদরাসা স্থাপন, ওযূখানা নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, শীতবস্ত্র বিতরণ, দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ (১৯৮৮ সালের বন্যায় মুরাদনগর উপযেলায় গিয়েও ত্রাণ বিতরণ করেছি), দরিদ্র ও রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য নগদ অর্থ প্রদান, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ, গরীব-মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পেরেছি। এখনো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে যাচ্ছি। সর্বশেষ গতবছর লকডাউনে কর্মীদের নিয়ে যেলা ব্যাপী বিপন্নদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি। এভাবেই সাংগঠনিক জীবনের দীর্ঘ ৩৭ বছর পার করেছি। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

তাওহীদের ডাক : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতির কথা যদি বলতেন!

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : সাংগঠনিক জীবনে তাঁর সাথে আমার উল্লেখযোগ্য অনেক স্মৃতি রয়েছে। তবে সবচেয়ে আনন্দময় স্মৃতি হ'ল ২০১১ সালের ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারী। ১৩ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে যেলা সম্মেলন শেষে পরদিন শুক্রবার সকাল থেকে অসুস্থ নেতৃবৃন্দকে দেখতে যাওয়া এবং মৃতদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করাসহ সর্বমোট ১৫টি সাংগঠনিক সফরের অসাধারণ ঘটনা। সবশেষে তাঁকে নিয়ে আমাদের নিজ গ্রাম জগৎপুরে আসি। আমীরে জামা'আতের আগমনের খবর শুনে সংগঠনের নেতা-কর্মী ও আহলেহাদীছ জনতার মিছিলে মিছিলে বুড়িচং বাযার এলাকা আলোড়িত হয়। তিনি আমাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর গ্রামের লোকদের দাবীক্রমে আগে থেকে আয়োজিত এক ওয়ায মাহফিলে অঘোষিতভাবে যোগদান করেন। আমীরে জামা'আতকে এক নযর দেখা এবং তাঁর কথা শোনার জন্য সেদিন উৎসুক জনতার যে ঢল নেমেছিল, সে স্মৃতি ভোলার মত নয়। দিনব্যাপী সফর শেষে গভীর রাতে তিনি কুমিল্লা শহরে ফিরে আসেন। একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ২০১৯ সালের ২৯শে নভেম্বর যেদিন তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী শাসনগাছা কমপ্লেক্স উদ্বোধনের জন্য এসেছিলেন। এভাবে তিনি যখনই কুমিল্লা সফর করেন, জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাঁকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

তাওহীদের ডাক : আপনি অনেক বাহাছ-মুনাযারা করেছেন বলে শুনেছি। এবিষয়ে দু'একটি ঘটনা বলবেন কি?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : কারো সাথে বাহাছ করা আমাদের দাওয়াতী নীতি ছিল না। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় বাহাছ করতে বাধ্য হয়েছি। আলিম পরীক্ষা দিতে বি-বাড়িয়া শহরের মাদরাসা কেন্দ্রে যাই। সেখানে ওযূ করতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের ছাত্রদের সাথে আমাদের বাদানুবাদ হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আড়াইবাড়ি কামিল মাদরাসার তৎকালীন উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান। যিনি পরে ঢাকা তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ হিসাবে যোগদান করেন। তিনি আমাদের উভয়পক্ষের মধ্যে ন্যায্য মীমাংসা করে দেন। তারপরও সেখানকার সিলেটী ছাত্ররা আমাকে ও আমার সাথী হাফেয আব্দুল্লাহকে বাহাছের জন্য মসজিদের ছাদে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সাথে বাহাছ হয় এবং তারা পরাজিত হয়। ফলে তাদের দলের কয়েকজন আমাদের সাথে যোগদান করে। পরবর্তীতে অনেকদিন তাদের সাথে আমার পত্র যোগাযোগ ছিল। এ ঘটনার পর মাওলানা সাঈদুর রহমান দীর্ঘ গবেষণার পর আহলেহাদীছ হয়ে যান। তিন বছর পূর্বে তিনি রাজশাহী তাবলীগী ইজতেমায় বক্তব্য দেওয়ার সময় এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন।

১৯৮০-এর দশকে একবার ঢাকা শহরে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে তুলাগাঁও নিবাসী ক্বারী আব্দুল মতীন আমাকে বখশীবাজার কাদিয়ানী মসজিদে নিয়ে যান। কাদিয়ানী এক আলেমের সাথে সেখানে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে 'ওফাতে ঈসা' নামে একটা বই তারা আমাকে দেয়। আমি তখন তাদের বই দিয়ে তাদেরকে ঘায়েল করা শুরু করি। ফলে তারা আমতা আমতা করে স্থান ত্যাগ করে।

একবার নিজ গ্রামে মাহতাব ফকীরের সাথে বাহাছ হয়। সে পরাজিত হলে গ্রামের লোকেরা মিছিল নিয়ে গিয়ে তার খানক্বা ভেঙ্গে দেয়। তাছাড়া নিজ গ্রামে কালা ফকীর ও তোতা মিয়াঁ ফকীরদের সাথে বাহাছ করি। গ্রামে শবেবরাতকে কেন্দ্র করে মাদরাসার আলেমদের সাথে বাহাছ করি। তারা পরাজয় বরণ করলে ১৯৭৭-এর পর গ্রামে আর কখনো শবেবরাত হয়নি। ধামতী আলিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীছ মাওলানা ফযলুল করীম ছাহেবের সাথে তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে তার মাদরাসাতেই বাহাছ করেছি। তাছাড়া জোরে আমীন, রাফউল ইয়াদায়েন ইত্যাদি বিষয়ে উস্তায আব্দুল মতীন সালাফীর সাথী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাহাছ করেছি।

সর্বশেষ ৫ই ডিসেম্বর ২০২০ ইং তারিখে কুমিল্লা শহরের কোতোয়ালী থানায় আমাদের নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের পক্ষ হয়ে মাযহাবীদের সাথে বাহাছের দায়িত্ব পালন করি। আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেক বাহাছেই আল্লাহ বিজয় দান করেন। *ফালিল্লাহিল হামাদ!*

তাওহীদের ডাক : আপনার নিজের কোন লেখনী আছে কি-না?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : সাংগঠনিক ব্যস্ততা ও শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের চাপে লেখার তেমন সুযোগ হয়নি। তবে 'ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ ও যিকির' নামে একটি পোস্টার ছাপিয়ে বিতরণ করি। এক সময় মাসিক 'সালাফী' পত্রিকার দরসে হাদীছ কলামে নিয়মিত লিখতাম। এক দরসে ফরয ছালাতের শেষে সম্মিলিত দো'আ বিষয়ে মাওলানা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী ছাহেবের বই থেকে রেফারেন্স দেওয়ায় সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকায় বিশাল প্রতিবাদ ছাপা হয়, যার কপি আজও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া 'সাহারী ও উহার আযান' নামে একটি বই পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। 'জুমআ'র আযান একটি না দু'টি' শীর্ষক আরেকটি বই অপ্রকাশিত রয়েছে।

তাওহীদের ডাক : সাংগঠনিক জীবনে আপনার অনেক সাথী মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার অনেকে সংগঠন ছেড়ে চলে গেছে। এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : হ্যাঁ, আমার সাংগঠনিক জীবনের বেশ কিছু সাথী ও কর্মী দূরে সরে গেছে। ইখলাছের সাথে আমি নিজে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং অন্যদের দ্বারাও যোগাযোগ করে কারণ জানতে চেয়েছি। তাদের কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাইনি। যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের জন্য দো'আ করি আল্লাহ যেন তাদের ক্ষমা করেন। আর যারা দুনিয়াবী স্বার্থে চলে গেছে তাদের জন্যও দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাদেরকে সংশোধনের তাওফীক দেন। আমীন!

তাওহীদের ডাক : আপনি তো এখন কুমিল্লা শহরে অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সের সভাপতি। সংক্ষেপে যদি এই মারকায প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে বলতেন!

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : আমাদের মুরব্বী আলেমগণ কুমিল্লা শহরে আহলেহাদীছ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। একথাটি শ্রদ্ধেয় পিতা ও অন্য আলেমগণের মুখে শুনেছি। পরবর্তীতে আমি নিজে কুমিল্লা শহরে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে যেলার মুরব্বী ও নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করে ব্যর্থ হই। অবশেষে 'আন্দোলন'-এর যেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বুড়িচং আগমন করেন। তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য কুমিল্লা আসার পথে উনি বললেন, ছফিউল্লাহ! কুমিল্লা শহরে একটা মারকায করার জন্য মাটি দেখ। আমি গাড়িতে বসা অবস্থায় দূর থেকে বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে শাসনগাছা এলাকায় মাটি দেখালাম, যা তখন পানিতে ডুবেছিল। উনি বললেন, এখানেই দেখ; এখন ডুবে আছে, পরে জেগে উঠবে। অতঃপর তিনি সেখানে মাটি ক্রয়ের জন্য 'আন্দোলন'-এর সাবেক নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ-এর নিকট তিন লক্ষ টাকা প্রদান করেন। যা দিয়ে ১৪ শতক মাটি কেনা হয়। এজন্য তিনি আমাকে ও মাওলানা মুছলেহুদ্দীনকে দিয়ে ৫ সদস্যের একটা কমিটি করে দেন। অতঃপর সেখানে মারকায স্থাপনের জন্য তাওহীদ ট্রাস্টের অর্থায়নে ১৯৯৬ সালে কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালে মসজিদ ও মাদরাসার গৃহ নির্মাণ শেষে উদ্বোধন করা হয়।

পরবর্তীতে ২০১৯ সালে আমাদের প্রচেষ্টায় সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলনে'র সুধী জনাব আবুল হাশেমের মাধ্যমে মসজিদ ও মাদরাসার জন্য আরো অর্থ সহযোগিতা পাই। যা দিয়ে মারকাযের নতুন তিন তলা ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। আমীরে জামা'আত এসে ২০১৯ সালের ২৯শে নভেম্বর শুক্রবার যার উদ্বোধন করেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবনে সহযোগী হিসাবে কাকে সবচেয়ে বেশী কাছে পেয়েছেন?

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : আমার সাংগঠনিক জীবনে নিঃস্বার্থ ও বিশ্বস্ত সাথী হিসাবে সবসময় কাছে পেয়েছি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কুমিল্লা যেলার বর্তমান সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীনকে। আল্লাহ তাকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাকের পাঠক এবং আহলেহাদীছ 'যুবসংঘে'র কর্মীদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু উপদেশ থাকলে বলুন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রতিষ্ঠিত একটি দাওয়াতী মুখপত্র। তাওহীদের ডাক খাঁটি দ্বীন শিক্ষার পাশাপাশি যুবকদের জন্য সাহিত্যচর্চাসহ বহুমুখী জ্ঞান লাভের পথ উন্মোচন করে দেয়। তাই পাঠকবৃন্দকে নিয়মিত তাওহীদের ডাক পাঠের আহ্বান জানাচ্ছি। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বন্ধুদের বলছি, আপনারা সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থেকে পরকালীন মুক্তির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। এখানেই রয়েছে যুবসমাজের মুক্তির দিক- নির্দেশনা। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন- আমীন!

তাওহীদের ডাক : আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ : তোমাদেরকেও ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।

নজ্দী-ওহাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মন্তব্য

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে এছলাম ধর্ম্মনীতির খুব নিকটবর্তী যদি কোন দল থাকে তাহা নজদিরা। ইহাদের চালচলন, ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকটা এছলামি প্রাথমিক যুগের মোছলমানগণের অনুরূপ। ইহাদের মধ্যে শের্ক, বেদআৎ আদৌ নাই। তাহারা নমাজ, রোজা ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মের পুরোপুরি পাবন্দ। তাহাদের প্রদেশে কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার আদৌ নাই। শরাব, তাড়ি, আফিম, ভাঙ্গ, সিদ্ধি, তামাক, চরুট, সিগারেট ইত্যাদি একটী প্রাণীও ব্যবহার করে না। চা পান করিলে তাহাতেও সামান্য নেশার ভাব আসিতে পারে মনে করিয়া চা, কফি পর্য্যন্ত তাহারা পান করে না। অথচ তাহাদের প্রতিবেশী হেজাজি আরবদের ন্যায় চা-পায়ী লোক খুবই বিরল। ইহারা নিতান্ত মত্তকি পরহেজগার। দুঃখের বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। দুনিয়ার বড় একটা খোজ খবর রাখে না। গোঁড়ামীতে চুড়ান্ত। ইহারাও কারো বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ইহারা এক সময় সমগ্র আরব দেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আব্বাছ বংশীয় ও ওছমানীয় বংশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদের সহিত নজদবাসীরা টক্কর দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

আরবদেশও আরব জাতির মধ্যে আজও এয়মন ও নজদ এই দুইটী ক্ষুদ্র রাজ্য নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং বলিতে গেলে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই দুই স্থানের আরবদের মধ্যে এখনও প্রাথমিক যুগের এছলামের শিক্ষা দীক্ষা অনেকাংশে বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাহারা কাহারোও অধীন হয় নাই। ইহাদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উচ্চ লক্ষ্য ও উচ্চ চিন্তা না থাকিলেও তাহাদের স্বাভাবিক শৌর্য-বির্য্য ও নৈতিকবল বিশেষ প্রশংসার্হ।

[মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খৃ.) রচনাবলী, প্রবন্ধ শিরোনাম : এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩); ১/২৮৩ পৃ.]

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে ১টি ৮তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং দোতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। নেকী উপার্জনের অনন্য মাস পবিত্র রমাযানে দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন-আমীন!

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, রকেট : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০

স্মৃতিচারণ : শেখ আব্দুছ ছামাদ

স্মৃতির পাতায় আব্দুছ ছামাদ

-আব্দুল আলীম বিন কাওছার মাদানী

[এক]

১৯৯২ সাল। দিন, তারিখ মনে নেই। রাজশাহীতে পড়তে যেতে হবে। কী দারুণ অনুভূতি! কিন্তু সেই ছোট্ট আমি একা একা যশোরেই তো যেতে পারি না, রাজশাহী যাবো কীভাবে! বলা হলো, যশোরের মণিরামপুর থানার মুজগুন্নী গ্রামের আরো দু'জন ভাইও পড়তে যাবে, তাদের সাথে যেতে হবে। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। তারা হলেন আতাউর রহমান ও সাইফুয্যামান। তারা বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও তাদেরও তখন এতদূর সফরের মত সক্ষমতা তৈরি হয়নি। সেজন্য আমাদের ৩ জনকে রাজশাহী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন ঐ গ্রামেরই সন্তান শ্রদ্ধেয় আব্দুল আহাদ সাহেব। যশোর রেলস্টেশনে পৌঁছার পর বুঝলাম, ভ্রমণটা রেলভ্রমণ হতে যাচ্ছে। রেলভ্রমণ! ভাবা যায়! সে এক অন্যরকম অনুভূতি। অবশ্য এর আগে একবার রেল ভ্রমণ করেছিলাম বলে একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু তখন অনুভূতি প্রকাশের মত বয়স হয়নি। টিকেট কাটা হয়ে গেল। অপেক্ষা ট্রেন আসার।

হঠাৎ হুইসেল বেজে উঠল। তাকিয়ে দেখি, মহানন্দা এক্সপ্রেস হাজির। অমনি চেপে পড়লাম ট্রেনে। ঝিকঝিক ঝিকঝিক ট্রেন চলল রাজশাহী পানে। গোধূলি বিকেলের পর নেমে এল রাতের অন্ধকার। ট্রেনেই দেখা হয়ে গেল আরো কয়েকজন ভাইয়ের সাথে, তারাও নাকি একই প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাবে। বাড়ি সাতক্ষীরায়। পরিচয়ও হয়ে গেলো ভাইদের সাথে। তারা হল, শেখ আব্দুছ ছামাদ, যিয়াউর রহমান, নূরুল্লাহ ও আখতারুয্যামান। আমাদের রাজশাহী পৌঁছতে রাত গভীর হল। রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে রিকশা যোগে রাণীবাজার নিয়ে যাওয়া হল আমাদেরকে। তখন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেটে। অনেক ডাকাডাকির পরও আমরা কাউকে ঘুম থেকে জাগাতে সক্ষম হলাম না। ফলে সেখানে রাত্রিযাপন আর করা হল না। পুনরায় ফিরে আসলাম রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে। সেই স্টেশন কিন্তু বর্তমান স্টেশন নয়; বরং সেটা ছিল পুরানো স্টেশন।

যাহোক স্টেশনের চেয়ারে বসেই রাত পার হল আমাদের। পরের দিন খুব ভোরে আমরা রওয়ানা দিলাম নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে। এই ছিল আব্দুছ ছামাদের সাথে আমার প্রথম স্মৃতি। এরপর থেকে এক যুগ ধরে একসাথে থাকা। একসাথে পড়াশোনা করা।

[দুই]

১৯৯৬/১৯৯৭ সাল হবে হয়তোবা। তখন আমরা 'আমীনুন নাহু' বইটি পড়ছি বা পড়ে ফেলেছি। সেখানে اسم صوت এ بَخْ، نَخْ শব্দদ্বয় আমরা পড়েছিলাম, যার উভয়টির বা শেষেরটি অর্থের ব্যাপারে আমরা জেনেছিলাম যে, এটি উট বসানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। একদিন আমি, শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী উস্তাদজীর বড় ছেলে আব্দুল আহাদ ও আব্দুছ ছামাদ বেড়াতে গিয়েছিলাম রাজশাহী চিড়িয়াখানায়। সাথে আর কেউ ছিল কিনা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। যাহোক চিড়িয়াখানায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা উটের কাছে গেলাম। উট দেখেই আমি বলে উঠলাম, بَخْ، نَخْ। কিন্তু উট তার নিজ গতিতেই রয়ে গেল। না বসল, আর না নড়াচড়া করল। ওরা বলল, আব্দুল আলীম! কি ব্যাপার! উট বসল না কেন? আমি বললাম, উটটা এ্যারাবিয়ান উট না তো, তাই আরবী বোঝে না আর কি। এই যে হাসি শুরু হলো, হাসি যেন আর থামেই না। হাসিতে দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা।

আব্দুছ ছামাদ প্রায়ই ঘটনাটা বলতো। আমাকেও একাধিক দিন বলেছে, আব্দুল আলীম! তোমার কি চিড়িয়াখানার সেই মজার ঘটনাটা মনে পড়ে?

আব্দুছ ছামাদ! তুমি চলে গেছো। এরকম বহু স্মৃতি রেখে গেছো। তোমাকে একজন ভালো বন্ধু পেয়েছিলাম। তোমাকে সব সময় আমানতদার ও ইনছাফদার দেখেছি। মহান আল্লাহ তোমাকে পরপারে সুখে রাখুন এবং দুনিয়ায় তোমার স্ত্রী, সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দিন। আমীন!

আব্দুছ ছামাদের নির্ধারিত আয়ু শেষ হয়ে গেছে, সে তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে। আজ-কাল-পরশু আমাদেরকেও একদিন যেতে হবে। সেই দিনটার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা যেন জান্নাতে আবার মুলাকাত করতে পারি-মহান রবের কাছে এই প্রার্থনা।

আব্দুছ ছামাদ ভাইয়ের স্মৃতিকথা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

রাজশাহী, নওদাপাড়াতে আমরা আসি ১৯৯৬ সালের মে মাসে। তখন আমি খুব ছোট। নওদাপাড়া মাদরাসায় এসে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে এসে মানিয়ে নিতে কষ্ট হলেও দিনগুলো বেশ ভালই কাটত।

কেননা এখানে অনেক খেলার সাথী পেয়েছিলাম। বিশেষ করে মারকাযের বেশকিছু ছাত্র ছায়ার মত সঙ্গী ছিল, যাদের মধ্যে দু'জন ছিল সাতক্ষীরার আব্দুছ ছামাদ ভাই এবং যিয়াউর রহমান। আগে থেকে পরিচয় না থাকলেও যেহেতু একই গ্রামের মানুষ, তাই তাদের সাথে ভাবটা বেশ গাঢ়ই হয়ে গেল। আব্দুছ ছামাদ ভাই আমাদের এক ক্লাস সিনিয়র ছিলেন আর যিয়া এক ক্লাস জুনিয়র। প্রতিদিন বিকালে খেলাধূলার সময় মাঠে তাদের সাথে দেখা হত। তবে খেলাধূলায় ততটা পারদর্শী না হওয়ায় আব্দুছ ছামাদ ভাই সাধারণত দর্শকদের সারিতেই থাকতেন। ফলে তাকে গল্পগুজবের সময়ই বেশী পেতাম। তখনই লক্ষ্য করতাম তিনি কথাবার্তায় বেশ স্পষ্টবাদী এবং বয়স কম হলেও যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সৎসাহসী। ক্লাসে, খেলাধূলার মাঠে কিংবা যে কোন বৈঠকে হক কথা বলাকে তিনি যেন কর্তব্য মনে করতেন। ফলে অনেক সময় তার কথাবার্তা বেশ কড়া ও ঠোঁটকাটা প্রতিক্রিয়া মনে হত। আবার সাধারণতঃ দেখা যায়, যারা মুখের উপর উচিৎ কথা বলতে পছন্দ করেন, রাগ তাদের নিত্য স্বভাব। আব্দুছ ছামাদ ভাইও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এই রাগী স্বভাবের মধ্যে তিনি যে বৈশিষ্ট্যটা ধরে রেখেছিলেন সেটা হ'ল তার মুখ ভরা হাসি।

দেখা হলেই একটা অন্তরখোলা হাসি দিয়ে কথা শুরু করতেন। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দাখিল পরীক্ষার পর আলিমের ক্লাস শুরু হলে আমরা ভাগ্যচক্রে এক ক্লাসের ছাত্র হয়ে গেলাম। সেই থেকে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর একই সাথে ক্লাস করেছি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বিভাগের ছাত্র হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা সাংগঠনিক কোন কাজে আমাদের প্রায়ই একত্রিত হওয়া হত। তার সাথে সেসব হারানো দিনের হাজারো স্মৃতি জমে আছে। আলাদাভাবে কোন স্মৃতিটা উল্লেখ করব?

আব্দুছ ছামাদ ভাইয়ের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা ছিল তার সততা এবং দায়িত্বশীলতা। দায়িত্ব সহজে নিতে চাইতেন না, কিন্তু একবার নিলে পূর্ণ সততার সাথে তা পালন করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিতেন। সেটা সংগঠনের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে। তার এই দায়িত্বশীল আচরণ সবার কাছে সুপরিজ্ঞাত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে পেশাগত জীবনে তিনি নওদাপাড়া মাদরাসায় শিক্ষক ও বোর্ডিং সুপার হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। বলা বাহুল্য, যে কোন হোস্টেলে বোর্ডিং সুপার তথা খাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটা প্রায় থ্যাংকলেস একটা জব। খুব কম ব্যক্তিকেই পাওয়া যাবে যিনি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাহ্বা পেয়ে থাকেন। হয় ছাত্র কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ তাকে সহ্য করতেই হয়। কিন্তু আব্দুছ ছামাদ ভাই সেদিক থেকে নিজগুণেই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। প্রশ্নাতীত সততার কারণে কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি যেমন ছিলেন বিশ্বস্ততার প্রতীক, তেমনি ছাত্ররাও ছিল তার প্রতি সন্তুষ্ট। সেজন্য পক্ষ-প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে সবার কাছেই তিনি একটা গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাজশাহী থেকে সাতক্ষীরা বাঁকাল মাদরাসায় ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার পর বাঁকাল মাদরাসার যে কোন সংবাদ পেতে বিশ্বস্ত সূত্র হিসাবে তাঁকেই ফোন দিতাম। গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া হয় খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যই। এরমধ্যেই তিনি সংবাদ পেলে বাসায় চলে আসতেন। গ্রামের নতুন প্রজন্মের ছেলেদের মধ্যে তিনি ছিলেন খুৎবা দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাই গ্রামের আদর্শবান ছেলে হিসাবে সবাই তাকে একনামে চিনত। অসুস্থ হওয়ার পর আশাবাদী ছিলাম খুব দ্রুতই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু ব্লাড ক্যান্সার চূড়ান্ত পর্যায়ে ধরা পড়ার পর সেই আশা ফিঁকে হয়ে যায়। মৃত্যুর আগে তাঁর সাথে একবারই কথা হয়েছিল, যখন তিনি ঢাকা ইবনে সীনা

হাসপাতালে ছিলেন। বলছিলেন, এখানে চিকিৎসা ভাল হচ্ছে না। অন্য কোথায় নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। করোনার কারণে দেশের হাসপাতালগুলোতে চলছে অচলবস্থা। পিজি বা ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার শত চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। তার শারীরিক অবস্থাও অবশ্য মুভমেন্টের উপযুক্ত ছিল না। প্লাটিলেটের ঘাটতির কারণে শরীরের রক্তপ্রবাহ কোনভাবেই ধরে রাখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ২৭ই মে'২১ রাত সাড়ে এগোরোটায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ এল। পরিণতি জানাই ছিল। তবুও অবিশ্বাসী মন মেনে নিতে চাইল না। তরতাজা মানুষটা এভাবে এত অল্প বয়সেই চলে যাবেন! বুকটা ধক করে উঠে। শরীর অসাড় হয়ে আসে। শূন্য দেয়ালে তাকিয়ে থাকি আর মনের স্ক্রীণে একের পর এক ভেসে উঠতে থাকে আব্দুছ ছামাদ ভাইয়ের জীবন্ত দিনের অজস্র স্মৃতি।

পরদিন দুপুরে সাতক্ষীরায় তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে গেলাম। বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে তাঁর সাড়ে চার বছর বয়সী ইয়াতীম সন্তানটি কারো কোলে চড়ে এগিয়ে এল। তার দিকে তাকিয়ে বেদনায় চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু জমা হয়। কাকতালীয়ভাবে আব্দুছ ছামাদ ভাইয়ের পিতাও তাকে প্রায় একই বয়সে ইয়াতীম করে চিরবিদায় নেন। সেই ব্লাড ক্যান্সার রোগেই। আল্লাহ তাঁর ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। তাঁর সন্তানকে পিতার পদাংক অনুসরণ করে মানুষের মত মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বাজেট সমাচার

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

ঠোঁটে রহস্যময় হাসি নিয়ে গাড়ি থেকে নামেন অর্থমন্ত্রী। হাতে থাকে ব্রিফকেস। ব্রিফকেসে থাকে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা। তবে সেটা সরাসরি মুদ্রায় নয়, কাগজের ঘোষণায়। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সব দেশেই বাজেটের দিন চিরাচরিত এ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়।

জাতীয় বাজেট একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলীল। যেখানে পরবর্তী ১ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল তুলে ধরা হয়। বাজেট কিভাবে প্রণীত হচ্ছে, বাজেটে কাদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে, কতটুকু ক্ষুণ্ন হচ্ছে; গৃহীত বাজেট জনগনের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কতটুকু সহায়ক ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের কৌতূহল থাকে। তাছাড়া কোনো দেশের নাগরিকদের বাজেট সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা যরূরীও বটে। কারণ বাজেটের অর্থ মূলত জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়েই বরাদ্দ করা হয়।

বাজেট কি?

বাজেট শব্দটির উৎপত্তিস্থল ফরাসী বোওগেট শব্দটি থেকে। যার অর্থ চামড়ার ব্যাগ কিংবা ব্যাগ। বাজেট হচ্ছে একটি দেশের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ। সরকারকে দেশ চালাতে হয়, সরকারের হয়ে যারা কাজ করে তাদের বেতন দিতে হয়। আবার নাগরিকদের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট বানানো সহ নানান কিসিমের উদ্যোগ নিতে হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরে কোথায় কত ব্যয় হবে এবং সেই ব্যয় কিভাবে নির্বাহ করা হবে তার পরিকল্পনার নামই বাজেট। বাজেট যে শুধু সরকারই তৈরী করে তা নয়; বাজেট ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনেরও হতে পারে। তবে ব্যক্তি বা পরিবারের সঙ্গে সরকারের বাজেটের একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে ব্যক্তি আয় বুঝে ব্যয় করে আর সরকার ব্যয় বুঝে আয় করে। ব্যক্তির বাজেট দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক হতে পারে। তবে সরকারের বাজেট সবসময় এক বছরের জন্য হয়। জাতীয় বাজেট হলো বাংলাদেশ সরকারের একবছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবের দলীল। যার সাংবিধানিক নাম- বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা Annual financial statement। জাতীয় বাজেট আপাতদৃষ্টিতে একটি অর্থনৈতিক প্রস্তাবনাপত্র মনে হলেও মূলতঃ এটি একটি রাজনৈতিক দলীল। বাজেটে সরকারী দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও অর্থনৈতিক চিন্তা প্রতিফলিত হয়। সরকারী দল তার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কতটুকু আন্তরিক, বাজেটে তার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি চিত্রায়িত হয়।

বাজেটের সময়সীমা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে থাকেন। সংসদে বাজেটের উপর আলোচনা হয়। প্রয়োজনে সংশোধন হয় এবং সবশেষে তা সংসদে ১ বছরের জন্য অনুমোদন লাভ করে। জাতীয় বাজেটের এই সময়কালকে Fiscal year বা রাজস্ববর্ষ ও বলা হয়। সরকারের বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন- ৫ বছর ব্যাপী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মাথায় রেখে বাজেট প্রণীত হয়। বাংলাদেশে অর্থবছর শুরু হয় জুলাই মাসে, শেষ হয় জুন মাসে। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় ১লা অক্টোবর, শেষ হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর। প্রতিবেশী ভারতে শুরু হয় এপ্রিল মাসে, শেষ হয় মার্চ মাসে।

বাজেট কাঠামো

সরকারের আয় ও ব্যয় কেমন হবে, সেই প্রশ্নে রাষ্ট্রের বাজেট দুই রকমের হয়ে থাকে। যেমনঃ

১. সুষম বাজেট ঃ সরকারের মোট আয় ও ব্যয় সমান হলে সেটি হচ্ছে সুষম বাজেট। অর্থাৎ সরকারের মোট ব্যয় পরিকল্পনা সমানই হচ্ছে সম্ভাব্য আয়।

২. অসম বাজেট ঃ সরকারের আয় এবং ব্যয় সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। অসম বাজেট আবার দুই রকমের হতে পারে। যেমন:

ক. উদ্বৃত্ত বাজেট ঃ ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশী হলে সেটি উদ্বৃত্ত বাজেট।

খ. ঘাটতি বাজেট ঃ ঘাটতি বাজেট হচ্ছে উদ্বৃত্ত বাজেটের ঠিক উল্টোটা। এখানে ব্যয় বেশী আয় কম।

সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে সুষম বাজেট করে থাকে। তবে সবসময় সুষম বাজেট করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল যখন ঘাটতি বাজেটকে বোঝা ভাবা হ'ত এখন বরং অর্থনীতিবিদরা মনে করন, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে বাজেটে কিছুটা ঘাটতি থাকা ভাল। এতে অর্থনীতিতে ঘাটতি পূরণের চাপ থাকে। অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহার বাড়ে। জিডিপি বৃদ্ধির তাগাদা থেকে অর্থনীতিতে উদ্দীপনা থাকে।

বাজেটের রূপরেখা ঃ জাতীয় বাজেটের ৪টি অংশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ১. প্রাপ্তি, ২. ব্যয়, ৩. বাজেট ঘাটতি, ৪. ঘাটতি অর্থায়ন।

১. প্রাপ্তি ঃ প্রাপ্তি বলতে বুঝায় সরকার কোন উৎস থেকে বাজেটের অর্থ সংগ্রহ করে। সরকার যে উৎস থেকে বাজেটের অর্থ সংগ্রহ করে তা দু'ভাগে বিভক্ত- ক. কর বাবদ প্রাপ্তি, খ. কর ব্যতীত প্রাপ্তি।

ক. কর বাবদ প্রাপ্তি : যেমনভাবে ব্যক্তির আয়ের উপর ট্যাক্স (আয়কর), ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট কর, খাজনা, ঘরবাড়ি জমি-জমা বাবদ কর। পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর আরোপিত কর। তাছাড়া বিভিন্ন পরোক্ষ কর যেমন : আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, মাদক জাতীয় দ্রব্যের জন্য আবগারি শুল্ক ইত্যাদি।

খ. কর ব্যতীত প্রাপ্তি : কর ব্যতীত সরকারে আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল সড়কে সেতুর টোল। ইজারা, প্রশাসনিক ফী, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি। এছাড়া আকাশপথ, রেলপথ, নৌযান ডাকবিভাগ ইত্যাদি

খাত থেকেও সরকার আয় করে থাকে।

২. ব্যয় ঃ

বাজেটে প্রস্তাবিত অর্থ তথা সরকারের প্রাপ্ত অর্থ মূলতঃ ২টি বৃহত্তর খাতে ব্যয় করা হয়।

ক. রাজস্ব ব্যয় : সরকার পরিচালনা এবং জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য যেসব খাতে অর্থ ব্যয় হয় তাই হচ্ছে রাজস্ব ব্যয়। যেমন : পুলিশ, চৌকিদার, সামরিক বাহিনী, সরকার কর্মকর্তা, কর্মচারী বেতন-বোনাস, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপতিদের সম্মানী, বাসস্থান ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, জনগণের দেওয়া আয়কর, ভ্যাট, শুল্ক ইত্যাদির সিংহভাগ উপরোক্ত খাত সমূহে ব্যয় হয়। অর্থাৎ সরাসরি জনগণের করের টাকার সরকার পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা জনগণের প্রভু নয় বরং তারা জনগণের সেবক। বর্তমানে যাদের রাষ্ট্রের কর্মচারী হওয়ার কথা, তারাই এখন প্রভু সেজে বসে আছে। এটি বাজেট পরিপন্থী।

খ. উন্নয়ন ব্যয় ঃ কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানীসহ ১৭টি চিহ্নিত খাতে সরকার তার উন্নয়ন ব্যয় খরচ করে থাকে।

৩. বাজেট ঘাটতি ঃ

সরকারের ব্যয় তার প্রাপ্তির চেয়ে বেশী হ'লে বাজেটে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। পূর্বে ঘাটতি বাজেটকে সরকারের দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা ভাবা হ'ত। তবে সমসাময়িক কালে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, উন্নয়শীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে ঘাটতি বাজেট যথেষ্ট কার্যকর।

৪. ঘাটতি অর্থায়ন ঃ

বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার ২টি উৎসের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস, অন্যটি হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ।

দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তবে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্ট কমে যায়। কেননা তখন দেশীয় বিনিয়োগকারীরা পর্যাপ্ত ব্যাংক লোন গ্রহণ করতে পারে না।

তাছাড়া ব্যাংকবহির্ভূত অভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি। তবে ব্যাংকবহির্ভূত ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিলে অধিক হারে সুদ দিতে হয়। এতে সুদ পরিশোধে সরকারকে বেশী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখতে হয়।

এক নযরে বাজেট ২০২১-২২ :

জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৩ হাযার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। গত ৩রা জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি এ বাজেট উপস্থাপন শুরু করেন। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট এটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের তৃতীয় বাজেট এটি।

বাজেটের মূল শ্লোগান ঃ 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'।

এবারের বাজেটে একনযরে আলোচিত বিষয় সমুহ হ'ল- শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭১ হাযার ৯৫৩ কোটি টাকা, করোনায় বরাদ্দ ১০ হাযার কোটি টাকা। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৮৯ হাযার কোটি টাকা। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা ৭.২%। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বাড়ছে। কর দিতে হবে না 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্যের। বাজেটে এবারও করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ টাকা। গ্রামে বাড়ি করতে গেলেও কর দিতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ৩২ হাযার ৭৩১ কোটি টাকা।

বাজেট নিয়ে কথা বলা কি যরূরী?

১. 'কিতাবুল খরাজ' নামে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর একটি বিখ্যাত কিতাব রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়, রাজস্ব কোথা থেকে ও কিভাবে নির্ধারণ হবে, কিভাবে বন্টন করা হবে- তার বিবরণ চেয়ে খলীফা হারূণুর রশীদের পক্ষ থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-কে অনুরোধ জানানো হ'লে তিনি কিতাবটি লিখেন। কিতাবের শুরুতেই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) যে কাজটি করেছেন সেটা হচ্ছে খলীফা হারূণুর রশীদের উদ্দেশ্য করে লম্বা একটি সম্ভাষণ উপদেশ ও ফযীলতের হাদীছ পেশ করেছেন। তাকে দ্বীনী নছীহত করেছেন। অতঃপর তিনি সেই সময় ও পরিবেশের আলোকে সরকারকে একটি বিস্তারিত রূপরেখা পেশ করেন। রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতিহাস ঐতিহ্যের জায়গা থেকে আমরা যদি বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমাদের হাতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিস্তারিত রূপরেখা আছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যদি তা সমাজে বাস্তবায়ন করতে না পারি তবে এসব তত্ত্বের মূল্য নেই। নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা, উপযুক্ততা অন্য কেউ ঘোষণা দিতে আসবে না। সেটা আমাদেরকেই করতে হবে। জাতীয় বাজেট দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব ইসলামপন্থীদের উচিত এ বিষয়ে সরকারকে সুপরামর্শ দেওয়া।

২. সরকারী অর্থের মালিক মূলত জনগণ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে- My money my responsibility। আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক, আমরা কর প্রদান করি এবং সেই করের টাকা দিয়ে সরকার চলে। সরকারী অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জনগণ কিভাবে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারে, বাজেটে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা থাকে। আমার প্রদানকৃত টাকা সুচারুভাবে খরচ হচ্ছে কিনা প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা রুটি-রোজগারের পথ সুগম হবে কিনা ধনী-গরীব বৈষম্য কমবে কিনা, দ্রব্যমূল্যের গতি উর্ধ্বগামী হবে না নিম্নগামী হবে, শিশুর শিক্ষার খরচ দেবে কিনা, কৃষিতে সরকার কত ভর্তুকি দেবে, এসব জানতে হলে আমাদের সবাইকে বাজেট নিয়ে সরব হতে হবে।

৩. মোটাদাগে বলতে গেলে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ তৎকালীন সরকার Value added tax (VAT) তথা মূল্য সংযোজন কর চালু করে। এই পদ্ধতিতে একটি পণ্য উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত যতবার হাত বদল হয় ঠিক ততবার কর দিতে হয়। ধরুন, আপনি একটি পাঞ্জাবী ক্রয় করবেন এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩টি স্তরে ভ্যাটের হিসাব করা হ'ল।

ক. তুলা উৎপাদন, খ. কাপড় বুনন ও পাঞ্জাবী তৈরী, গ. দোকান বিক্রি।

ধরুন, ভ্যাট ব্যতীত তুলার মূল্য ১০০ টাকা। এখন ৪.৫% ভ্যাটে গার্মেন্টস সেটি ১০৪.৫০ টাকা দিয়ে ক্রয় করবে। এখন যদি গার্মেন্টস ৫.৫০ টাকা লাভ করে সেটি ১১০ টাকায় বিক্রি করবে। দোকানদার সরকারকে ৬% ভ্যাট দিয়ে ১১৬.৬০ টাকায় পাঞ্জাবী ক্রয় করবে। দোকানদার যদি ১৩.৪০ টাকা লাভ করে তাহলে পাঞ্জাবীর দাম হবে ১৩০ টাকা। এখন ক্রেতারা সরকারকে ৮% ভ্যাট দিয়ে ১৪০ টাকায় পাঞ্জাবী ক্রয় করবে। অর্থাৎ ১৪০ টাকার একটি পণ্যে জনগন মোট (৪.৫০+৬.৬০+১০.৪০)=২১.৫০ টাকা ভ্যাট দিবে। এভাবে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে এখন সরকারের রাজস্ব আয়ের সর্বোচ্চ খাত হচ্ছে ভ্যাট। আর এই রাজস্ব আসে জনগণের ঘাম ঝরা অর্থ থেকে। অতএব বাজেট নিয়ে জনগণের ভাবনা থাকা আবশ্যক। তার প্রদত্ত অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে, তা সম্পর্কে সচেতন থাকা একজন মুমিনের জন্য যরূরীও বটে।

শেষকথা :

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ঘাটতি বাজেট হওয়ার কারণে আমাদের দেশের বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করতে হচ্ছে সুদ পরিশোধে এবং এতে আর্থিক খাতে ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের শর্ত মেনে ঋণ করে দ্বিগুণ তিনগুণ সূদ দিতে হচ্ছে। এভাবে দেশের উন্নয়ন কল্পনা করা অসম্ভব বলে মনে করি। তাছাড়া একটি মুসলিম দেশ হিসাবে সূদভিত্তিক অর্থনীতির দাসত্ব করাটা আমাদের জন্য বড়ই লজ্জাজনক। অন্যদিকে বাজেট আসে, বাজেট যায় কিন্তু জনতার ভাগ্য অপরিবর্তনীয়ই থেকে যায়। বর্তমানে বাজেট একটা ছকবাঁধা বাজেটে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর বাজেটের পরিমাণ বাড়ে। সেই হিসাবে বাজেটের যে খাতগুলো আছে, এগুলোতে আমরা কিছু যোগ-বিয়োগ করা হয়, আর দু-একটা বড় বড় প্রকল্প যোগ-বিয়োগ করা হয়। এতে প্রকৃত জনসেবা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ছাপ কমই থাকে। যা থাকে, তাতে কেবল সমাজে নির্দিষ্ট একশ্রেণীর সুবিধাভোগীদেরই উপকার হয়। বৃহত্তর জনস্বার্থ সেখানে প্রায় উপেক্ষিতই থাকে। আমরা আশা করব বিকল্প সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে এবং জনগণের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনীতি গতিশীল করা হোক। প্রয়োজনীয় ট্যাক্স আরোপ করা হোক, তবে ভ্যাট নামক অক্টোপাশকে বন্ধ করা হোক। একটি মুসলিম দেশ হিসাবে সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভিশাপ থেকে জাতিকে রেহাই দেয়া হোক। তবেই বাজেট দুনিয়াবী ও পরকালীন উন্নয়নের পথে আমাদের পরিচালিত করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন-আমীন!

[লেখক : শিক্ষার্থী, বিএসএস সম্মান, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

মনুষ্যত্বের ছিন্ন মস্তক

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

মানুষ ও মনুষ্যত্ব শব্দ দুটি একে অপরের সাথে দেহ ও আত্মার মত সম্পর্কযুক্ত। আমরা প্রায়শ বলি 'আগে মানুষ হও' অথবা বলি 'আমাদের মানুষের মত মানুষ হতে হবে।' সমাজে প্রচলিত এই উপদেশ বাণীর অর্থ কী? আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে যুগ যুগ ধরে আমরা যে শারীরিক অবয়ব বহন করছি এবং তা নিয়েই কবরে যাচ্ছি; সেটা কি আমাদের মানুষ হওয়ার পরিচয় বহন করে না? গভীরভাবে চিন্তা করলে বিবেক নামক আদালত আমাদেরকে বিপরীত জবাবটাই দিবে। কারণ মানুষের পরিচয় রক্ত মাংসে গড়া দৈহিক কাঠামোতে নয় বরং মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার মনুষ্যত্বে। স্যুট বুট কিংবা আলখেল্লা পরিহিত পরিপাটি প্রত্যেক আদমের দেহ এই পৃথিবীতে মানুষ নামক জীবের অস্তিত্বের আলামত মাত্র। জীবসত্ত্বা থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলে যেমন দেহের মূল্য থাকে না তদ্রুপ মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেলে তাকে আর মানুষ বলা যায় না। তাহলে এখন প্রশ্ন হ'ল মনুষ্যত্ব কী?

মনুষ্যত্বের ইংরেজী শব্দ যেটি লাতিন শব্দ Humanitas থেকে এসেছে, যার অর্থ মানুষের প্রকৃতি, দয়া। ইংরেজী অভিধানের পরিভাষায় 'The quality or state of being kind to other people or to animals' অর্থাৎ মনুষ্যত্ব মানুষ অথবা প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়ার গুণ। অনুরূপভাবে বাংলা অভিধানে অর্থ করা হয়েছে মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য, মানুষের থাকা উচিত এমন সদগুণ, মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি।[১]

শব্দটির অর্থের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে মনুষ্যত্ব বলতে ধরা-বাধা নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলীকে বুঝায় না। বরং মনুষ্যত্ব এমন কতক প্রকৃতি বা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সমাহার, যা মানুষের মধ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান।

যেমন হাদীছে এসেছে, إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا 'আল্লাহ্‌র একশত রহমত রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি রহমত দ্বারাই তারা পরস্পরকে স্নেহ করে, এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই বন্য প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালোবাসে।[২] দয়া-মমতার স্বভাবজাত এই গুণটি আল্লাহ মানুষ ও পশুর মধ্যে জন্মলগ্ন থেকেই দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর মধ্যে তেমন কোন ফারাক থাকছে না। কিন্তু বিবেক নামক আরো একটি গুণ মানুষকে জন্মলগ্ন থেকেই দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায় বুঝার বোধশক্তি জাগ্রত করতে সক্ষম। এখানে এসে মানুষ ও পশুর মধ্যে মানবোচিত গুণের বিস্তর ফারাক হওয়ায় মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যখন মানুষের মধ্য হতে স্রষ্টা প্রদত্ত স্বভাবজাত মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ তথা বিবেকবোধ নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তখনই মানুষ ও পশুর মধ্যে থাকা পার্থক্যের সীমানা প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়ে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তখন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। আসুন নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেখি।

ঘটনা- ১ : ইয়াসিন মোল্লা মারা গেছেন দুপুরে। দুপুর গড়িয়ে রাত পেরিয়ে পরদিন দুপুর তবুও নিথর দেহটা ঠায় পড়ে আছে। বাবার লাশ ফেলে রেখে ৬০ শতক জমি নিয়ে ঝগড়া করছে ইয়াসীন মোল্লার ছেলেরা। পাঁচ সন্তানের জনক প্রায় নব্বই বছর বয়সী এই বৃদ্ধ জমি-জমার বিরোধের কারণে মৃত্যুর পূর্বেও সন্তানদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। রক্ত-ঘাম এক করে বড় আদরে যাদের লালন পালন করলেন, মৃত্যুর পরেও তাদের কাছ থেকে পেলেন না ন্যূনতম সহমর্মিতা।

ঘটনা-২ : মেয়ে-জামাই বাড়ি আসলে খুশি হয় না কোন বাবা-মা? সানন্দে সক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারই মেয়ে জামাইয়ের জন্য সর্বোত্তম মেহমানদারি করেন। কিন্তু সে মেয়ে জামাই মাসুদ রানার জীবনের জন্য কাল হল। নিজের মেয়েই ঘুমের ওষধ দিয়ে অচেতন করে বাবা, মা ও ছোট বোনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। হত্যার পর পুলিশকে ফোন করে বলে 'তিনটা খুন করেছি, তাড়াতাড়ি আসেন নাহলে আরো ২ জনকে খুন করবো!'

ঘটনা- ৩ : ঢাকার বংশালের স্থানীয় বাসিন্দা সুলতান। যেমন নাম তেমন তার প্রভাব। ফেইসবুকে ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা যায়, বাবার বয়সি এক রিকশাচালক বৃদ্ধকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে এবং উপর্যুপরি থাপ্পড় মারছে। থাপ্পড়ের আঘাত সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ তৎক্ষনাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তবুও এ নরপশুর পাশবিক আচরণ থামে নি।

---

১. *সংসদ বাংলা অভিধান, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ : ৫৫৮; সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমি), জানুয়ারী ২০১০ পুনর্মুদ্রণ, পৃ : ৪৪৮; আধুনিক বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমি), এপ্রিল ২০১৬ সংস্করণ, পৃ : ১০৭৭।*

২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৫।*

ঘটনা- ৪ : তিন সন্তানের জননী শাহনাজ লুকিয়ে পরকীয়া করেন। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না তার। পরকীয়া প্রেমিকও একাধিক সম্পর্কে জড়িত। সেটা নিয়েই ঝগড়ার জেরে এক পর্যায়ে প্রেমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। পাটার উপর হাত-পা রেখে ছুরিতে শিল পাথর দিয়ে আঘাত করে বিচ্ছিন্ন করে অঙ্গ। অতঃপর পাঁচ টুকরো সেই লাশকে থরে থরে সাজিয়ে ভাবলেশহীন হৃদয়ে বসে আছেন। আহ কী বিভৎস সে দৃশ্য!

উপরোক্ত ঘটনাগুলি আজকের সভ্য সমাজের সাধারণ চিত্র। দিন যায় দিন আসে ঘটনার ঘনঘটা চলতে থাকে। এক ঘটনার নিচে চাপা পড়ে ডুকরে কাঁদে আরেক ঘটনা। করোনায় মৃত স্বজনকে ফেলে রেখে পালানোর ঘটনা এখন আর আমাদের বিস্মিত করছে না। ধর্ষণের খবরবিহীন একদিনও সূর্য হয়ত সকালে উঠে না। প্রেমে ব্যর্থ, সংসারে টানাপোড়ন কিংবা ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশায় আত্মহত্যাই যেন একমাত্র মুক্তি। নিজ স্ত্রীকে খুন করে মরদেহ নিয়ে ফেইসবুক লাইভে স্বামীর উচ্ছ্বাস, কুপিয়ে যখম করে অস্ত্র হাতে হিন্দী গানের সাথে ফেইসবুকে লুঙ্গি ড্যান্সের ভিডিও প্রকাশ মনুষ্যত্বের কোন প্রকারের মধ্যে পড়ে? খবরের কাগজের শিরোনামে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীর আত্মহত্যার নেপথ্যে বেরিয়ে আসছে আপত্তিকর টিকটক ভিডিও। টিকটক, লাইকি প্রভৃতি এ্যাপসের মাধ্যমে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা সস্তা জনপ্রিয়তা পেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। টিকটকার 'অপু ভাই' কিংবা 'হৃদয় বাবু' গ্রেফতার না হ'লে এ অন্ধকার জগতের কথা হয়ত অজানাই থেকে যেত। মাদক ব্যবসা, ধর্ষণ, নারী পাচারসহ কোন অপরাধ করে নি তারা? অপরদিকে ফ্রী ফায়ার, পাবজিসহ বিভিন্ন কিসিমের অনলাইন গেমসের নেশা কোমলমতি শিশুদের পর্যন্ত খুন করতে উদ্যত করছে। সময়ের সবচেয়ে আলোচিত সামাজিক অবক্ষয় কিশোর গ্যাং। নিজ নিজ এলাকায় আধিপত্য চালাতে গিয়ে চুন থেকে পান খসলেই খুন করা যেন তাদের নেশা। কখনো সিগারেট খাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বে, কখনো কথিত বড় ভাইকে সালাম না দেওয়ায়, কখনো রাস্তায় জমে থাকা পানির ছিটা গায়ে লাগায় আবার কখনোবা মাদকের টাকা ভাগাভাগির জেরে খোদ গ্যাং লিডারই খুন হচ্ছে সহযাত্রীর হাতে। শুধু রাজধানীতে এ ধরনের ভয়ংকর কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা ৭৮টি, যার সদস্য সংখ্যা ২ হাজারের বেশী। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পালিত এ সমস্ত গ্যাং গ্রুপের রয়েছে কিম্ভুতকিমাকার নাম। যেমন- মাইরা-লা, কানা জসিম গ্রুপ, লাড়া-দে, চিনে ল, কোপাইয়া দে, বাঁধন গ্রুপ, পলক গ্রুপ, গাংচিল, চেতাইলেই ভেজাল, দ্যা কিং অব গাইরালা, বগা হৃদয়, জলন্ত মিলন গ্রুপ, রোমান্টিক গ্রুপ ইত্যাদি।[৩] কথায় আছে বৃক্ষ তোমার নাম কি- ফলে পরিচয়। উপরোক্ত নামগুলোই বলে দিচ্ছে এসব বিষবৃক্ষ কি ফল দিতে পারে! প্রাত্যহিক জীবনে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, উগ্রতা, স্বার্থপরতা, ক্রোধ মানুষের বিবেকের উজ্জীবনী ক্ষমতাকে ধ্বংস করছে। হতাশার চাদরে আবৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে নিজ পরিবারই মানুষের কাছে আশার প্রদীপ ও নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু পরিবার নামক বটবৃক্ষের ছায়াকে পৃথিবীর একমাত্র নিরাপদস্থল মনে করা হলেও সেখানে আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলজ্বল করছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী কেউ কারো কাছে নিরাপদ নয়। সমাজে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হতে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, গুম-খুন, সুদ-ঘুষ, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, চাঁদাবাজি অর্থ লোপাট, ইভটিজিং, অপহরণ, প্রতারণা মানুষের অন্তরাত্মা থেকে আদব-আখলাক, শৃঙ্খলাবোধ, স্নেহ-ভালোবাসা, সততা-বিনয়, উদারতা, সহযোগিতা বা সহমর্মিতার গুণাবলী কেড়ে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে আজ ভাগাড়ে পড়ে থাকা মানবাকৃতির রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তকটা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের ছিন্ন মস্তক। জন্মদাতা পিতার হাতে খুন হওয়া ছিন্নভিন্ন নিষ্পাপ শিশুর নিস্তব্ধ দেহটা যেন সেই শিশুর নয় বরং মনুষ্যত্বের মৃতদেহ! তাইতো নৈতিক কবি শেখ সা'দী কবিতায় লিখেছেন-

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
حقیقت آدمی باش و گرنه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

মনুষ্যত্বের আত্মা বহনকারী হে মানবজাতি
পোশাকের উজ্জ্বলতায় মেলে না মহত্ত্ব বা খ্যাতি

৩. *দৈনিক যুগান্তর, ২০ জুন ২০২১, পৃঃ ১০, কলাম ৫।*

প্রকৃত মানুষ হও নতুবা এ দেহ পাখির মত
যার কথামালাও ফুটে উঠে মানবের মত।

প্রিয় পাঠক, স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রীক বর্বর মানুষগুলোর এহেন অমানবিক নিষ্ঠুরতা একদিনে গড়ে উঠেনি। দিনে দিনে ইসলামের নীতি-আদর্শ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসানোর দরুন আমাদের হৃদয় থেকে মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়ে পশু প্রবৃত্তি স্থান করে নিচ্ছে।

সেজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাত খেতাব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পশুর সাথে তুলনা করে বলেন أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا- 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*।

সুতরাং মনুষ্যত্ব জাগ্রত করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের কাছে ফিরে আসতে হবে। সে ইসলামের কাছে, যে ইসলাম পিপাসিত চতুষ্পদ জন্তু বিড়ালের প্রতি দয়া দেখানোর জন্য পতিতাকে জান্নাতী ঘোষণা করে। শুধুমাত্র অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হওয়ার দরুণ অনুতপ্ত ১০০ খুনের আসামীকে ক্ষমা করে। হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর বুক ফেড়ে কলিজা চিবানোর মত ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য বর্বর মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয়দানকারী মহিলাকেও ক্ষমা করে। সে ইসলামের নবী মনুষ্যত্বের মূর্ত প্রতীক মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অন্যরা নিরাপদ থাকে।[৪]

তিনি আরো বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দুর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন'।[৫]

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাও নি। মানুষ বলবে, হে প্রভু! কিভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব, খাবার দিব, পানি পান করাবো; আপনি তো সারা জাহানের প্রভু? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ, পিপাসার্ত, ক্ষুধার্ত ছিল? তাদের যদি দেখতে যেতে, খাবার, পানি দিতে তাহলে সেখানে আমাকেই পেতে'।[৬]

যদি উপরোক্ত হাদীছগুলোর প্রকৃত মর্মার্থ আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাহলে আমরা মরে গেলেও আমাদের মনুষ্যত্ব বেঁচে থাকবে। দ্বিতীয়ত প্রকৃত শিক্ষা ও সুশৃঙ্খল সমাজ মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। সমাজের অরাজকতা ও মানুষের নৈতিকতা ধ্বংসের একমাত্র কারণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া। আজ হয়ত শিক্ষিত মানুষের হার বেড়েছে কিন্তু শিক্ষিত মানুষ বাড়ে নি। তাইতো প্রাবন্ধিক **মোতাহের হোসেন চৌধুরী** লিখেছেন, 'কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায় কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশীদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়'।[৭]

সুতরাং পরিশেষে বলবো, বর্তমান যান্ত্রিক প্রযুক্তির যুগে আমাদের অনুজরা প্রযুক্তির ব্যবহারে হয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে কিন্তু চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ফলে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত এমন এক জাতি আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি যাদের দ্বারা কখনো সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই সমাজ, মানুষ ও মনুষ্যত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় ওহীর আলোয় আলোকিত হয়ে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। নিজের মধ্যে দ্বীনী মূল্যোবোধকে জাগ্রত রাখা, মূল্যোবোধের চর্চাকে নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন।

[মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. *বুখারী হা/ ১০।*
৫. *বুখারী হা/ ২৪৪২।*
৬. *মুসলিম হা/ ২৫৬৯, আহমাদ হা/ ৮৯৮৯।*
৭. *মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য, নবম-দশম শ্রেণী, সংস্করণ- ২০১৮, পৃঃ ৮৮।*

ইসলামের প্রথম সমাচার

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

আল্লাহ্র প্রথম সৃষ্টি : কলম

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সৃষ্টি সমূহের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হ'ল কলম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ 'আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম তৈরী করেন। এরপর তিনি কলমকে বলেন, লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি লিখব? তখন আল্লাহ বলেন, তুমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সমস্ত জীবের তাকদীর লিখ'।[১]

আবার প্রতিবছর লাইলাতুল কদরের রাত্রিতেও তাক্বদীর লেখা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ 'সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়' *(দুখান ৪৪/৪)*।

এভাবে মায়ের গর্ভেও তাক্বদীর লেখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ 'জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্রবিন্দু স্থির থাকার পর সেখানে ফিরিশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদিগার! সে কি দূর্ভাগা না পূণ্যবান? তখন লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলতে থাকে, সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন নির্দেশ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। তার আমল, আচরণ, নিয়তি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ফলকটিকে ভাজ করে দেওয়া হয়। তাতে কোন সংযোজন করা হবে না এবং বিয়োজনও নয়'।[২]

প্রথম অবতীর্ণ ৫ আয়াতের মধ্যেও কলমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কলমের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা কোন জ্ঞান আহরণ করতে হ'লে কিতাবাদি পড়তে হবে আর সেটা লিখিত না হ'লে কিভাবে সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *(আলাক্ব ৯৬/৪-৫)*।

প্রথম দিন : রবিবার

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রথম একটি দিন সৃষ্টি করলেন এবং তার নাম রাখলেন ইয়াউমুল আহাদ বা রবিবার। অতঃপর আরেকটি দিন সৃষ্টি করলেন এবং তার নাম রাখলেন ইয়াউমুল ইছনাইন বা সোমবার। তৃতীয়বার আরেকটি দিন সৃষ্টি করলেন এবং তার নাম রাখলেন আছ-ছুলাছা যভ মঙ্গলবার। এরপর চতুর্থবার সৃষ্টি করলেন এবং তার নাম রাখলেন আরবিআ বা বুধবার। অতঃপর পঞ্চমবার সৃষ্টি করলেন এবং নাম রাখলেন আল-খামীস বা বৃহস্পতিবার। অতঃপর আল্লাহ রবিবার ও সোমবার পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। আর মঙ্গলবারের দিন পাহাড় সৃষ্টি করলেন। এই দিনটিকে মানুষ 'ইয়াউমুন ছাকীল' বলে থাকে। এরপর তিনি জনপদ, পাহাড়, নদী গাছ-পালা বুধবার সৃষ্টি করলেন। পশু-পাখি, চতুষ্পদ জন্তু, পোকা-মাকড় এবং আপদ-বিপদ সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার। আর মানুষকে সৃষ্টি করেন শুক্রবারের দিন। আর সমস্ত সৃষ্টি শেষ করেন শনিবারের দিন'।[৩]

প্রথম মানুষ : আদম (আঃ)

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।[৪]

প্রথম নবী : আদম (আঃ)

প্রথম মানুষ হিসাবে আদম (আঃ) প্রথম নবীও ছিলেন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين 'প্রথম নবী হলেন আদম (আঃ) এবং তাদের সকলের শেষ নবী হলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)'।[৫]

প্রথম ক্বিয়াসকারী : ইবলীস

প্রথম ক্বিয়াসকারী হ'ল ইবলীস। ইবনু সীরীন বলেন, أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَايِيسِ

১. *আবু দাউদ হা/৪৭০০; তিরমিযী হা/৩৩১৯।*
২. *মুসলিম হা/২৬৪৪।*
৩. *তাফসীরে তাবারী ২১/৪৩৩; আত-তারীখুল কাবীর ৭/১০০ পৃ.; আল-জারাহ ওয়াত তাদীল ৭/৪৭ পৃ.; আল-উজমা ৮৮১ পৃ.; তারীখে দেমাশক ১/৫০পৃ.।*
৪. *মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।*
৫. *আস-সীরাত লি-হিব্বান ৩৮৪ পৃ.; ফৎহুল কাবীর ১/৪৬৬ পৃ.।*

www.tawheederdak.com

'প্রথম ক্বিয়াসকারী হ'ল ইবলীস। আর ক্বিয়াসের মাধ্যমেই সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করা হয়েছিল'।[৬]

হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র শত্রু ইবলীস প্রথম ক্বিয়াস করে বলে, قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 'সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে' *(আরাফ ৭/১২)*।

প্রথম নারী : হাওয়া (আঃ)

আদম (রাঃ)-এর পর প্রথম নারী হলেন মা হাওয়া (আঃ), যাকে আদমের পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 'অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন'।[৭] হাওয়া (আঃ)-এর মূল হ'লেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে 'হাওয়া' বলা হয়, যা 'হাই' (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন'।[৮]

আদম (আঃ)-কে প্রথম দর্শনকারী সৃষ্টি : ইবলীস

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন জান্নাতে আদমের আকৃতি তৈরী করলেন এবং যতদিন ইচ্ছা এভাবেই রেখে দিলেন, তখন ইবলীস তার চারিদিকে ঘুরছিল এবং লক্ষ্য করছিল এটা আবার কি? অতঃপর যখন সে দেখল যে এর ভিতরে ফাঁকা রয়েছে তখন সে বুঝল যে এটা এমন সৃষ্টি যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না'।[৯]

মানবজাতির প্রথম গৃহ : কা'বা

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ 'নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো মক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী' *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম- (কাবা গৃহ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অতঃপর কোনটি। তিনি বললেন, মাসজিদুল আক্বসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই দু'টির মধ্যে কালের ব্যবধান কতটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে যেখানেই ছালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই ছালাত আদায় করে নিবে। সেটিই মসজিদ'।[১০]

আসমানে প্রথম পাপী :

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর সকলকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। সকলে সিজদা করলে ইবলীস করেনি হিংসার বশবর্তী হয়ে। মহান আল্লাহ বলেন مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 'আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে' *('আরাফ ৭/১২)*।

প্রথম ভুলকারী : আদম (আঃ)

প্রথম ভুলকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আদম (আঃ)। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا 'আর আমরা ইতিপূর্বে আদমের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (এই মর্মে যে, 'তুমি এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না)। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমরা তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি' *(ত্বহা ২০/১১৫)*।

এজন্য প্রবাদে আছে, 'প্রথম মানুষ প্রথম ভুলকারী'।

ইবনু আব্বাস বলেন, 'তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আর এটা হয়েছিল অমনযোগিতা ও ভুলে যাওয়ার কারণে'।[১১] অন্যত্র ইবনু আব্বাস বলেন, 'এজন্য মানুষের নাম ইনসান' বা মানুষ রাখা হয়েছে কারণ সে তার অঙ্গীকার ভুলে গিয়েছিল'।[১২]

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম আক্রমণ :

আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ানো এবং তাদের জান্নাতী পোষাক খুলে ফেলা। মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর বলেছিলেন, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ 'কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। কিন্তু শয়তান তাদের প্ররোচনা দিয়েছিল এই বলে যে আল্লাহ তোমাদের এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এই জন্য যে যাতে তোমরা দু'জন ফিরিশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে যাও। কুরআনের ভাষায় মহান আল্লাহ বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 'অতঃপর তাদের

৬. *ইবনু আবী শায়বা ১৪/৮৬; দারেমী হা/১৮৯; বায়হাক্বীর আল-মাদখাল হা/২২৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া ৩/১৯৬ পৃ.।*
৭. *নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮।*
৮. *(কুরতুবী), বাক্বারাহ ৩৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০২।*
১০. *বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; মিশকাত হা/৭৫৩।*
১১. *কুরতুবী ১১/২৫১ পৃ.।*
১২. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/৩২০; তাফসীরে তাবারী ১৮/৩৮৩।*

লজ্জাস্থান যা পরস্পর থেকে গোপন ছিল তা প্রকাশ করে দেবার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন কেবল এজন্যে যে, তাহলে তোমরা দু'জন ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এখানে চিরস্থায়ী বসবাসকারী হয়ে যাবে' *(আরাফ ৭/২০)*।

এরপর যা হ'ল তা কুরআনের ভাষায়- فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا 'অতঃপর যখন তারা উক্ত বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল' *(আরাফ ৭/২২)*। আর এটাই হ'ল শয়তানের প্রথম আক্রমণ।

পৃথিবীতে সংস্কৃতি বিকাশের প্রথম ধাপ :

পৃথিবীতে সংস্কৃতি বিকাশের প্রথম ধাপ হ'ল পোষাক। যদিও অনেক নাস্তিক পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীকে পোষাক সংক্রান্ত অপবাদ দিয়ে থাকে। অথচ আদম ও হাওয়া (আঃ) তাদের থেকে জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়া পরপরই তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 'ফলে তারা জান্নাতের পাতাসমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল' *(আরাফ ৭/২২)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আরাফ ৭/২৬)*।

সুতরাং বলাই যেতে পারে মানুষের প্রথম ফিৎরাত, প্রথম মমনশীলতার আবির্ভাব ঘটে পোষাকের মাধ্যমে'।[১৩]

পৃথিবীতে প্রথম কুরবানী :

পৃথিবীর প্রথম কুরবানী আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবীল ও কাবীলের। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 'তুমি তাদের নিকট বর্ণনা কর আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সত্যসহকারে। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হ'ল, কিন্তু অন্যেরটা কবুল হলো না। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।

১৩. পোষাক, ইবনু আশুর ৮/৮৩-৮৪।

পৃথিবীতে প্রথম হত্যা :

পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড আদম (আঃ)-এর দুই সন্তানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। কাবীল তার ছোট ভাই হাবীলকে হিংসার বশবর্তী হত্যা করেছিল।[১৪] কিন্তু ছোট ভাই তাকে বাধা পর্যন্ত দেইনি। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্ব প্রভু আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৮)*।

পৃথিবীতে প্রথম পাপকারী ও হত্যাকারী :

পৃথিবীতে প্রথম পাপকারী ও হত্যাকারী হ'ল কাবীল। তাই পৃথিবীতে যত অন্যায়ভাবে হত্যা হবে তার পাপের একটা অংশ তার আমলনামায় লিখা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسَنَّ الْقَتْلَ 'যে কাউকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার খুনের হিস্যা আদম পুত্র (কাবিল)-এর উপরও গিয়ে বর্তাবে। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রথা চালু করে'।[১৫]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ 'কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম (আঃ)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে'।[১৬]

প্রথম রাসূল : নূহ (আঃ)

প্রথম রাসূল হলেন হযরত নূহ (আঃ)। শাফা'আতের হাদীছে এসেছে, ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষজন আদম (আঃ)-এর পর নূহ (আঃ)-এর নিকট এসে বলবে, يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ 'এ মাটির পৃথিবীতে আপনিই প্রথম রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে 'কৃতজ্ঞ বান্দা' বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে সুফারিশ করুন'।[১৭]

সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত :

সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত শুরু করেন ফেরেশতাগণ। মৃত ব্যক্তি ছিলেন আদম (আঃ)'।[১৮]

[লেখক : পিয়ারপুর, ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী

১৪. তাফসীরে কুরতুবী ৬/১৩৩ পৃ.।
১৫. তিরমিযী হা/২৬৭৩; ইবনু মাজাহ হা/২৬১৬।
১৬. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/২১১।
১৭. বুখারী হা/৩৩৪০; মুসলিম হা/১৯৪; মিশকাত হা/৫৫৭২।
১৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৯১; আহমাদ হা/২১২৭০৮, সনদ ছহীহ, আলবানী, যঈফাহ হা/২৮৭২-এর আলোচনা।

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

-ইরফানুল ইসলাম

গ্রন্থের লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৫৪। মূল্য : ৫৫০ টাকা। ১ম প্রকাশ : মার্চ ২০১৫। শেষ (৩য়) সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৬।

ভূমিকা ঃ- উর্দূ কবি হালী বলেন,

'হেরা থেকে নেমে জাতির কাছে এলেন
এবং একটি পরশমণির টুকরা সাথে নিয়ে এলেন'

(মুসাদ্দাসে হালী ১৩ পৃ.)।

বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ঘোর তমসাচ্ছন্ন পৌত্তলিক আরবের বুকে প্রেরিত হন। তরুণ বয়সে তাঁর আদর্শবাদী নীতির ফলে সকলের নিকট তিনি ভূয়সী প্রশংসিত হন। নবুঅতপ্রাপ্তির মাধ্যমে প্রভুর পক্ষ হতে প্রকৃত মানবীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার পর ভোগবাদী মানুষকে সঠিক পথ বাতলে দেবার জন্যে এলাহীবাণী কুরআন প্রাপ্ত হন। রাসূল (ছাঃ) সে মোতাবেক তাওহীদের দাওয়াত দিলে কাঙ্গাল ও মযলুম জনতার মধ্যে এক নতুনত্বের শিহরণ জেগে ওঠে। তারা যেন এ চিরন্তন আহবানের মধ্যে অধিকার ফিরে পাওয়ার আভা পাচ্ছিল। মহাজন কর্তৃক নিগৃহীত হবার নিয়তিই ছিল যে কৃতদাসের, সে যেন নিজেকে সার্বভৌম ভাবতে লাগল। কিন্তু বস্তুবাদী সমাজপতিরা পার্থিব স্বার্থ কুপোকাত হবে ভেবে তাওহীদের চিরঞ্জীব আহ্বানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বধ করতে না পারলেও দেশান্তর করে ছাড়ে। মদীনায় গিয়ে ইসলামের সুষ্ঠু দাওয়াত প্রচারে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ছোট-বড় ৯০টি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সার সংক্ষেপ ঃ গ্রন্থটির প্রারম্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাবস্থল আরব জাতি, আরবের অবস্থান এবং মক্কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। আরবরা তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত আদনান-এর সম্প্রদায়ভুক্ত। ত্রিকোণ সাগর বেষ্টিত প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী আরব উপদ্বীপটি সকল নবী-রাসূলদের আগমনস্থল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হ'ল, এখানকার অধিবাসীরা ব্যবসায় অভ্যস্ত থাকায় বণিকদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ত। পৃথিবীর নাভিস্থল খ্যাত মক্কার সামাজিক অবস্থা এককথায় might is Right 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে পরিচালিত হত। সমাজে পুঁজিবাদী নিখাদ অর্থব্যবস্থা চালু থাকার ফলে এক শ্রেণীর মানুষ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হলেও সিংহভাগ মানুষের নিত্যসঙ্গী ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। তবে তাদের সততা, আমানতদারিতা, মেহমানদারীসহ স্মৃতিশক্তি এতই তীক্ষ্ম ছিল যে, একবার কোন কিছু শুনলে হুবহু মুখস্ত বলে দিতে পারত। হয়তোবা এসব সদগুণাবলীর কারণে বিশ্বনবীকে আল্লাহপাক এই এলাকায় প্রেরণ করেন। যাতে তারা তাদের প্রখর স্মৃতিতে কুরআন ও হাদীছকে অবিকৃত রাখতে পারে। আরবের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ আলেম আমর বিন লুহাই বিদ'আতে হাসানাহ্র দোহাই দিয়ে সর্বপ্রথম শাম থেকে 'হোবল' মূর্তি চড়া দামে খরিদ করে এনে মক্কায় স্থাপন করে। অতঃপর ক্রমেই সারা মক্কায় ভাস্কর্য পূজার সয়লাব শুরু হয়ে যায়।

গ্রন্থটির **১ম ভাগে** রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম, বংশ ও শৈশব থেকে নবুঅতপ্রাপ্তি পর্যন্ত মাক্কী জীবনের বেদনাদায়ক ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা হাশেমী গোত্রে ১ম হস্তীবর্ষের ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। আজন্ম ইয়াতীম মুহাম্মাদ ৬ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। অনাথ মুহাম্মাদ এবার এলেন ৮০ বছরের প্রবীণ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ছত্রছায়ায়। কিন্তু দু'বছর না যেতেই পিতামহ পরপারে পাড়ি জমান। ফলে পিতৃব্য আবু তালিব আমৃত্যু ভাতিজার একান্ত অভিভাবক হিসাবে জীবনপাত করেন। শৈশব থেকে যুলুম ও অন্যায়ের হিংস্রতা স্বচক্ষে দেখতে দেখতে তরুণ মুহাম্মাদের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠে। যুবক বয়সে তিনি জনকল্যাণমূলক ৪ দফা দাবী উত্থাপন করলে সকলের নিকট তা গৃহীত হয়। কুরায়েশগণ এটিকে 'হিলফুল ফুযূল' নামে আখ্যায়িত করেন। এটির সফল কার্যক্রমের ফলে সমগ্র মক্কায় শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে এবং মুহাম্মাদের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'আল-আমিন' তথা পরম বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ ৪০ বছর বয়সে উপনীত হ'লে আল্লাহর নিকট হতে এলাহীগ্রন্থ কুরআন প্রাপ্ত হন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম তাওহীদের জ্ঞানার্জনের অনুশাসন দেয়ার পর শিরকী জাহেলিয়াতে আবর্জনাময় ভূষণ ঝেড়ে সমাজ বিপ্লবের অপরিসীম দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পুরো সমাজ যেখানে বস্তুবাদিতায় নিমগ্ন, এমন বৈরী পরিবেশে সমাজ পরিবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাইতো উর্দূ কবি বলেন,

'বায়ু প্রবাহ ফিরানো কঠিন
স্রোতকে উল্টানো কঠিন,
কিন্তু অতটা কঠিন নয়, যতটা কঠিন
একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে আনা'।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বাগ্রে আপনজনদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। সর্বপ্রথম পর্বতচূড়ার এ প্রদীপ্ত আহ্বান মযলুম জনতার

মধ্যে এক নতুন কম্পন জাগিয়ে তুলে। অধিকার বঞ্চিত মানবতা যেন এই অমর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্যে ন্যায্য পাওনা ফিরে পাওয়ার আগাম বার্তা পাচ্ছিল। অপরদিকে ভাতিজার হৃদয় নিংড়ানো আহ্বান চাচা আবু লাহাব বরদাশত করতে পারেনি। সমাজনেতারাও ধর্মীয় নেতৃত্ব ও দুনিয়াবী স্বার্থের অপমৃত্যু দেখতে পেয়ে বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কারো পরোয়া না করে বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে ভিন দেশীদের নিকট ব্যাপকহারে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু আবু লাহাবের পরিচালিত গীবতকারী জোটদল তার পিছু ছাড়েনি।

মোড়লদের সমস্ত আপোষ ও লোভনীয় প্রস্তাব অকৃতকার্য হওয়ায় তারা তাওহীদের অবিনশ্বর আহ্বানকে গলা টিপে চিরবিদায় করে দেবার জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের উপর লোমহর্ষক নির্যাতন শুরু করে। ৫ম নববী বর্ষে উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করলে রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের পরিত্রাণের উপায় হিসাবে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেন। এদিকে হিজরতের খবর জানতে পেরে নেতারা সীমান্তে প্রহরা জোরদার করতে লাগল এবং তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য হাবশায় গিয়ে বৃথা অপচেষ্টা করে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসে। কারণ বিদেশের মাটিতে যুলুমের খবর পৌঁছে গেলে সেখানে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে নরপিশাচ নেতারা গোত্রনেতা আবু তালিবকে হাত করতে চেষ্টা কম করেনি। অনন্যোপায় হয়ে তারা বনু হাশেম ও মুত্তালিবের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কট জারী করে, যা তিন বছর স্থায়ী হয়। বয়কটকালীন অতিশয় কষ্টক্লিষ্ট সহ্যের কিছুদিন পর সামাজিক ঢালস্বরূপ চাচা এবং পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নির্ভরকেন্দ্র স্ত্রী খাদীজা পরপর ইহলোক ত্যাগ করেন। চাচার মৃত্যুকালে ভাতিজার করুণ আকুতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং শয়তানের শিখণ্ডি গোত্রনেতাদের প্ররোচনা বিজয়ী হয়।

শত্রু পরিবেষ্টিত ও আশ্রয়হীন মযলুম নবী প্রৌঢ়ত্বের এই ৫০ বছর বয়সে পদব্রজে সাহায্যকারী সন্ধানের নিমিত্তে তায়েফ গমন করলেও উৎপীড়িত হয়ে ফিরে এসে দ্বিগুন উৎসাহে দাওয়াত দিতে থাকেন। কুচক্রীদের দ্বারা দিনে অপদস্ত হবার ভয়ে রাত্রিতে দাওয়াত প্রদানকালীন আক্বাবাহর বায়'আতের ফলে হিজরতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইয়াছরেবীরা নিজেদের সাপে-নেউলে দূরত্ব ভুলে মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে। এদিকে কুরায়েশ নেতারা হিজরতে বাধা দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও মুসলমানরা দ্বীন ও প্রাণ রক্ষার্থে মাতৃভূমি বিসর্জন দেয়।

গ্রন্থটির **২য় ভাগে** মদীনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সংগঠিত যুদ্ধসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনায় সর্বমোট ৪টি দল গড়ে উঠেছিল। ১. আউস ও খাযরাজ গোত্র ২. ইহুদীদের ৩টি গোত্র ৩. নাছারা ও ৪. ইবনে উবাইয়ের গুপ্ত দল। ১ম হিজরী সনেই মযলুম মুসলমানদের দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়। এরপর থেকেই রাসূল (ছাঃ) সীমান্তে টহল অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। অতঃপর ২য় হিজরীতে 'বদর' প্রান্তরে তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার প্রথম সশস্ত্র মোকাবেলা সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদের ঈর্ষণীয় বিজয়ের ফলে তাদের ঈমানী শক্তি ও হিম্মত দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কুরায়েশরা মদীনার ধূর্ত মুনাফিক ও ইহুদীদের সাথে গোপন সংস্রব করে রাসূল (ছাঃ)-কে সেখান থেকে অপসারিত করার জন্য চূড়ান্ত অপচেষ্টা করতে থাকে। একাজে তারা যাতে স্বার্থক হতে না পারে সেজন্য রাসূল (ছাঃ) পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত মদীনা চার্টার বা 'মদীনা সনদ' হিসাবে মানবতার সামনে পেশ করা হয়।

নবগঠিত মদীনা রাষ্ট্রের ক্রমোন্নতি দেখে হিংসায় জর্জরিত ইহুদীরা ৫ম হিজরীতে বেদুঈন গোত্রগুলোসহ কুরায়েশদেরকে পুনরায় উস্কানী দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ১০০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী গড়ে মদীনার উপর আপতিত হয়। এদিকে রাসূল (ছাঃ) দক্ষ গুপ্তচরের মাধ্যমে অবগত হয়ে মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য তিনদিকে বেষ্টিত পাহাড়ের বিপরীতে উত্তর পার্শ্বে দৈর্ঘ্যে ৫০০০ হাত পরীখা খনন করেন বলে একে 'খন্দকের যুদ্ধ' বলা হয়। মদীনার বিরুদ্ধে সমগ্র আরব সম্প্রদায়ের এই সর্ববৃহৎ হামলায় মাসাধিককাল অবরোধ শেষে আল্লাহ্র সাহায্যে মুসলিমরা বিজয়ী হয়।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাথীসহ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার অদূরবর্তী 'হোদায়বিয়া' নামক স্থানে কুরায়েশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে বিস্তর সমঝোতার পর রাসূল (ছাঃ) তাদের সঙ্গে ১০ বছর মেয়াদী ৪ দফা বিশিষ্ট শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবাজ কুরায়েশদের মধ্যে যুদ্ধ নির্বাপিত হ'লে বিভিন্ন গোত্র এবং শক্তিধর সম্রাটদের নিকটে রাসূল (ছাঃ) পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন।

সন্ধির দু'বছর না যেতেই মিথ্যার পূজারী কুরায়েশদের হাতে চুক্তি লঙ্ঘিত হয়। যার ফলে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয় ত্বরান্বিত হয়, যা মুশরিক নেতাদের দর্প চূর্ণ করে আরব উপদ্বীপ থেকে চিরকালের জন্য শিরক নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এদিকে রোমকরা মুতার যুদ্ধের গ্লানিকর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য মদীনায় হামলার দুঃসাহস দেখালে রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রতিরোধে সৈন্যসামন্তসহ রোম সীমান্তে যাত্রা করলে তারা আতংকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এতে সারা আরবে মদীনার ইসলামী খেলাফত অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর রাসূল (ছাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায়ের আশংকা করলে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জে সকলকে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বিদায়ী নছীহত দেন। সেখানে ইসলাম পূর্ণতা পাওয়ার মাত্র ৮১ দিন পর ১১ হিজরীর ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থটির **৩য় ভাগে** নবী পরিবার, নবী পত্নীগণের মর্যাদা, রাসূল (ছাঃ)-এর শারিরীক গঠন, তার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং একাধিক বিবাহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এভাগে কুরআন ও হাদীছ জীবন্ত মু'জেযা হওয়ার ২৬টি চাক্ষুষ প্রমাণও উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে বর্ণিত মর্মস্পর্শী কিছু ঘটনা :-

১. হাবশার মুহাজিরগণ মদীনায় গমনের প্রাক্কালে সম্রাট নাজাশী তাদের সাথে সংসার বিরাগী ৭০ জন রাহেব প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রেরণ করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে সূরা ইয়াছিন পাঠ করে শুনান। তখন অবিরল ধারায় তাদের দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তারা বলে ওঠেন ইনজীলের সাথে কুরআনের কি অদ্ভুত মিল! অতঃপর তারা সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. কুরায়েশদের কর্তৃক বনু হাশেম ও মুত্তালিবের সাথে বয়কট চলাকালীন উভয় গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হয়। সঞ্চিত খাদ্যশস্য ফুরিয়ে গেলে তারা গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হয়। ক্ষুধার্ত নারী ও শিশুদের ক্রন্দনধ্বনি গিরি সংকটের বাইরের লোকেরা শুনতে পেত। মক্কার ব্যবসায়ীরাও জিনিসপত্রের চড়া দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল, যা ক্রয় করা কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এদিকে রাতের বেলা সকলে শুয়ে যাওয়ার পর আবু তালিব দুশ্চিন্তায় রাসূল (ছাঃ)-কে বিশ্বস্ত আপনজনদের সাথে বিছানা বদল করাতেন। যাতে কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে না যেতে পারে।

৩. ছুহায়েব রূমী হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কিছুদূর যেতেই মুশরিকরা তাকে ঘিরে ফেলে। তখন সওয়ারী থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমরা জানো আমার তীর সাধারণত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমার তূনে একটি তীর বাকী থাকতেও তোমরা আমার কাছে ভিড়তে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। অতএব তোমরা যদি দুনিয়াবী স্বার্থ চাও, তবে মক্কায় রক্ষিত বিপুল ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলো নিয়ে নাও এবং আমার পথ ছাড়। তখন তারা পথ ছেড়ে দিল। মদীনায় পৌঁছে এই ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, 'হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে'।

৪. মুতার যুদ্ধে খ্রিষ্টান রোমকদের ২ লক্ষ ফৌজের বিরুদ্ধে মুসলিমদের মাত্র ৩ হাজার সৈন্য প্রেরিত হয়। পরামর্শ সভায় আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার তেজস্বিনী ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে মুসলিমরা রোমকদের মুখোমুখি হয়। তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ বর্শার আঘাতে শহীদ হলে জা'ফর বিন আবু তালিব যুদ্ধের ঝান্ডা উত্তোলন করেন। এসময় তার ঘোড়া 'শাক্বরা' নিহত হলে মাটিতে দাড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় তার ডান হাত কর্তিত হলে বাম হাতে নিশান আঁকড়ে ধরেন। অতঃপর বাম হাতের ছেদন ঘটলে বগলে ধ্বজা চেপে ধরেন। এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলে ইবনু রাওয়াহা পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি শহীদ হয়ে গেলে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি নিযুক্ত হন। মুসলিম বাহিনীর সীসাঢালা ঐক্য, অপূর্ব বীরত্ব এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র সাহায্যে খালেদের হাতে বিজয় পদচুম্বন করে।

৫. প্রতিনিধি দলসমূহ আগমনের বছরে একদিন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের নিকট একদল লোক আসবে, যারা ইসলামের ব্যাপারে তোমাদের চাইতেও নম্র হৃদয়'। অতঃপর ইয়ামনের আশ'আরী গোত্রের ৭০০ লোক মুসলমান হয়ে কেউ আযান দিতে দিতে, কেউ কুরআন পাঠ করতে করতে, কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে বলতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারা মদীনায় প্রবেশের সময় খুশীতে কবিতা পাঠ করতে থাকেন, 'কালকে আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে মিলিত হব। মুহাম্মাদ ও তার দলের সাথে'। রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেন, 'তোমাদের নিকট ইয়ামন বাসীরা এসে গেছে। এদের অন্তর বড়ই কোমল, হৃদয় খুবই নরম'। ওমর ও আব্বাস (রাঃ) এই দৃশ্য দেখে কাঁদতে থাকেন।

প্রতিক্রিয়া :

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীর উপরে আমার সর্বপ্রথম পাঠ এই গ্রন্থটি। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ যে দ্বীনের পথে কতটা সংগ্রামী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতটা সিদ্ধহস্ত এবং সমাজে নিজেদের প্রভুত্ব ভন্ডুল হবার আশংকায় সমাজনেতারা যে কতটা নির্দয় হতে পারে গ্রন্থটি পড়ার পূর্বে কখনো বুঝিনি। ৮৫৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট পুস্তকটির আকৃতি দেখে প্রথমে তা পড়ার হিম্মত হয়ে উঠেনি। কিন্তু আগ্রহভরে বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনী, নবী জীবনের শেষ অধ্যায়, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের কষ্টকর হিজরত এবং তাদের উপর অকথ্য নির্যাতনের বিবৃতি পড়ে বইটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ি। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি পুরোপুরি পাঁচবার পড়ে ফেলি। গ্রন্থটি পড়ে যে কোন পাষাণ হৃদয় ধারণকারী ব্যক্তিরও অক্ষি কোণে অশ্রু ঘনীভূত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা শেষ নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার দাবীদার হয়ে তার পরিচয় ও জীবন প্রবাহ জানব না, এটা হতেই পারে না। এজন্য এই গ্রন্থটি অপরিহার্যভাবে অধ্যয়ন করতে আমি সকলকে পরামর্শ দিব।

শেষকথা

মদীনার দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক রাসূল (ছাঃ)-এর উদারনৈতিক দাওয়াত ভাষা ও অঞ্চলগত রেখা অতিক্রম করে কিভাবে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী অখণ্ড ইসলামী জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল, তার প্রতিবিম্ব হচ্ছে সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থটি। এমনকি এটি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের হকের পথে দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী চেতনা এবং গরীব-দুখীদের রক্ষণস্থলের প্রতিচ্ছবিও প্রদান করে। গ্রন্থটি বাস্তবিকই খুব চমকপ্রদ। মাননীয় লেখককে মহান আল্লাহ তা'আলা উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

[লেখক : ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

চিকিৎসাবিজ্ঞানী টমাস লডার ব্রুন্টন যেভাবে মুসলিম হন

-হাবীবা রহমান উজরা

চিকিৎসক ও পদার্থবিদ স্যার টমাস লডার ব্রুন্টন ১৮৪৪ সালে স্কটল্যান্ডের রক্সবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া করেন ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের 'ফার্মাকোলজি' বিভাগে এবং সেন্ট বার্থলোমিউজ হাসপাতালে কর্মজীবন শুরু করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯০০ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক সম্মানজনক 'নাইটহুড' এবং ১৯০৮ সালে সম্মানজনক 'বেরনট' খেতাব লাভ করেন। 'এনজিনা পেকটোরিজ'-এর চিকিৎসায় 'এমেল নাইট্রিট'-এর ব্যবহার চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান বলে মনে করা হয়। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ ও গবেষণার পথ ধরে ইসলামের সন্ধান পান এবং মহানবী (ছাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিম হওয়ার পর তিনি স্যার জালালুদ্দীন লডার ব্রুন্টন নামধারণ করেন। 'ইসলাম আওয়ার চয়েজ' গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায় তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সম্পর্কে লেখেন, আমি খ্রিস্টান মা-বাবার প্রভাবেই প্রতিপালিত হই। অল্প বয়সেই ধর্মতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। আমি চার্চ অব ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। অনিয়মিতভাবে মিশনারীতে কাজ করতেও ইচ্ছুক ছিলাম। কয়েক বছর আগে আমি 'দুঃখ চিরন্তন' মতবাদের প্রতি মনোযোগী হই। যার মূলকথা হ'ল সীমিতসংখ্যক মানুষ ছাড়া পৃথিবীর সব মানুষ দুঃখে নিমজ্জিত। এ মতবাদ আমার কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল এবং আমি সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলাম। আমার যুক্তি ছিল স্রষ্টা নিজের শক্তি ব্যবহার করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন যে তারা চিরদিন ব্যথিত হবে; জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমময় হবে না। তাঁর এই অবস্থান বহু মানুষের চেয়ে নিচুমানের। এরপর নিজেকে প্রশান্ত করতে আমি অন্য ধর্মগুলো পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিই।

আমার ভেতর ইবাদত ও প্রকৃত স্রষ্টার আনুগত্যের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা বলে আমরা বাইবেলের অনুসারী। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখি তাদের দাবী বাস্তবতাবিরোধী। আমার ভেতর প্রশ্ন জাগল এটা কি সম্ভব বাইবেল ও যিশুখ্রিস্টের শিক্ষাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে? সুতরাং গভীর মনোযোগসহ বাইবেল পাঠ শুরু করলাম। অধ্যয়নের পর বুঝলাম আমার আরো জানার প্রয়োজন আছে। আমি সত্য জানতে এবং নিজেকে মূল্যবান মুক্তায় পরিণত করতে ইসলাম অধ্যয়ন শুরু করি। ইসলামে এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমাকে সে সময় আকর্ষণ করছিল।

অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠ করি। আগে আমি তাঁর সম্পর্কে খুব সামান্যই জানতাম। কিন্তু এটা জানতাম যে খ্রিস্টানরা আরবের এই নবীর নিন্দা করে। আমি সেসব নিন্দা পেছনে ফেলে নিরপেক্ষভাবে তাঁর জীবনী পাঠ করলাম। কিছুটা পাঠের পরই বুঝতে পারলাম মহান স্রষ্টা ও চিরন্তন সত্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। তিনি মানবতার পক্ষে যে অবদান রাখেন, তারপরও তাঁর সমালোচনা চরম অন্যায়। যেসব মানুষ ছিল বন্যমূর্তির উপাসনাকারী, অপরাধের মধ্যে বেঁচে থাকত; নোংরামি, উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতায় মগ্ন ছিল, তিনি তাদের কাপড় পরিয়েছেন, তাদের পরিচ্ছন্নতা শিখিয়েছেন, তাদের ব্যক্তিত্ববান, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও অতিথিপরায়ণ করেছেন এবং তাদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করে তাদের একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্ধান দিয়েছেন। ফলে ইসলাম ধর্মান্তরিত মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। মানবসভ্যতায় উল্লেখ করার মতো অগণিত অবদান তাঁর রয়েছে। ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম যে, তাঁর মতো একজন পবিত্র ব্যক্তির সমালোচনা করছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা। আমি যখন ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখন ভারত থেকে মিয়া আমীরুদ্দিন আসেন। তিনি লাহোরের প্রথম মেয়র ও বেলুচিস্তানের চিফ কমিশনার ছিলেন। তিনি আমার ভেতরের আগুনকে স্ফুলিঙ্গে পরিণত করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি ইসলাম গ্রহণ করি-ফালিল্লাহিল হামদ।

দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা

-লিলবর আল-বারাদী

সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সুশিক্ষা ব্যতীত বৈধ পন্থায় কোন জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারেনা। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক জাতির জন্যে বাধ্যতামূলক। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পরে সর্বপ্রথম বিশেষ পন্থায় শিক্ষা দেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 'অনন্তর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বলে দাও, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও' *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। এই আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায়, প্রথম মানব আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সকল বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহ্র প্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত *(লোকমান ৩১/২০)* ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব *(ইসরা ১৭/৭০)*। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকারবশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*।

আদম (আঃ) যখন জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব পেলেন তখন অপর জ্ঞানী ইবলীস হিংসার বর্শবতী হয়ে অহংকার করল এবং শয়তানে পরিণত হ'ল। জ্ঞানীর মর্যাদা অবিসংবাদিত, তবে ঐ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা নয়, যারা দম্ভভরে সত্যকে উপেক্ষা করে থাকে। ইসলামের নবজাগরণের প্রথম বাণী বা 'অহি' হ'ল اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'তুমি পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞানী হয় না। হোক তা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা হোক সে নিরক্ষর ব্যক্তি। তবে সার্টিফিকেট জ্ঞানীর মানদণ্ড নয়। জ্ঞানীর মানদণ্ড হলো আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া। আর তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি ইহকালে যেমন শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে বরিত এবং পরকালেও তেমনি সম্মানিত। সুতরাং জ্ঞানী হতে হবে, তবে অহংকারী নয়। নিম্নে জ্ঞানীদের পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

ইলম বা জ্ঞানের পরিচয়

'ইলম' আরবী শব্দ العلم মাছদার থেকে উৎকলিত। যার অর্থ বুঝা, উপলব্ধি করা, অবহিত হওয়া, আহরণ করা ইত্যাদি। ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক এই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং পরিচয় ফুটে ওঠে। দ্বীনের সঠিক বুঝ হ'ল প্রকৃত ইলম। যাকে অহির জ্ঞান বলা হয়। অর্থাৎ যে ইলম তার প্রভুর নৈকট্য এনে দেয়, তা-ই প্রকৃত ইলম।

পক্ষান্তরে যে ইলম তার প্রভুর সন্ধান থেকে গাফেল করে দেয়, তাই শয়তানের পদাঙ্ক অনুকরণীয় ইলম। এই জ্ঞান মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিণাম জাহান্নাম। মোদ্দাকথা যে ইলম আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন থেকে বিমুখ রেখে দুনিয়ামুখী করে এবং আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়, তাই শয়তানী ইলম।

ইলম প্রধানত দু'প্রকার। **এক.** বৈষয়িক জ্ঞান; **দুই.** অহির জ্ঞান।

এক. বৈষয়িক জ্ঞান : মানুষ ও সকল প্রাণীর মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে তা থেকে লব্ধ জ্ঞান। যেমন- অন্যের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, দয়া এবং দুনিয়াতে চলাফেরা করার জন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বৈষয়িক জ্ঞান বলে।

দুই. অহির জ্ঞান : কুরআন-সুন্নাহ হ'ল অভ্রান্ত সত্যের চিরন্তন উৎস, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত জ্ঞান। কুরআন-সুন্নাহ্র মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে না। আর এই জ্ঞানের আলোকে মানুষ অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা বিবেকবান মানুষে পরিণত হয়। অহি তথা কুরআন-সুন্নাহ হ'ল জ্ঞানের প্রকৃত আধার। সালাফে ছালেহীন অহির জ্ঞানকে সর্বদা প্রাধান্য দিতেন। কেননা অহির জ্ঞানের সাথে বৈষয়িক জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটলে তবেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়। আর দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য অহির জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম (অহির জ্ঞান) শিক্ষা করা ফরয'।[১]

নিম্নে প্রকৃত ইলমের পরিচয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. তাক্বওয়া জ্ঞানের মূল :

তাক্বওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ ও অমানুষের মর্যাদার মানদন্ড হ'ল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো সত্যিকারের ভয়' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

১. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামি' হা/৩৯১৩; ছহীহ হাদীছ; মিশকাত হা/২১৮।*

www.tawheederdak.com

اللهِ أَتْقَاكُمْ ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাক্বী’ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। একদিন জনৈক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, أَخَذْتَ طَرِيْقًا ذَا شَوْكٍ؟ ‘তুমি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে চলেছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কীভাবে চলেছ? লোকটি বলল, إِذَا رَأَيْتُ الشَّوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ أَوْ جَاوَزْتُهُ أَوْ قَصُرْتُ عَنْهُ ‘আমি কাঁটা দেখলে তা এড়িয়ে চলি। অথবা ডিঙিয়ে যাই অথবা দূরে থাকি’। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ذَاكَ التَّقْوَى ‘এটাই হ’ল তাক্বওয়া’।[২] অর্থাৎ অন্যায় ও মন্দ পথগুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখে সাবধানে হকের পথ চলাই আল্লাহকে ভয় করে চলা। ইবনু কাছীর বলেন, তাক্বওয়ার মূল অর্থ হ’ল ‘অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা’।

তাক্বওয়াই হ’ল প্রকৃত ইলম। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি, وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ ‘দ্বীনের মূল হ’ল তাক্বওয়া’।[৩] তাক্বওয়া ব্যতীত অহির জ্ঞানেরও কোন মূল্য নেই। জনৈক আরবী কবি বলেন, لو كان للعلم شرف من دون التقي* لكان أشرف خلق الله إبليس ‘যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত।[৪] আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ ‘অধিক হাদীছ জানাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং প্রকৃত জ্ঞানার্জন হ’ল আল্লাহভীতি অর্জন করা।[৫] সুতরাং দ্বীনের সঠিক বুঝের মাধ্যমে যে তাক্বওয়া অর্জিত হয়, তাকেই প্রকৃত ইলম বলা হয়। আর এটা সবাই অর্জন করতে পারেন না। আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। হযরত মু‘আবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى، ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন’। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহ (জ্ঞান) দাতা’।[৬]

দ্বীনের জ্ঞানই প্রকৃত ইলম। আর প্রকৃত ইলমের স্বরূপ তাক্বওয়া। আর অধিক ইলম অর্জনকারী তাক্বওয়াশীল বান্দায় রূপান্তর হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ ‘অধিক ইবাদত করার চেয়ে অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম’।[৭]

২. সালাফে ছালেহীনদের পরিভাষায় জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ :

(১) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সালাফে ছালেহীন ‘ইলম’ বলতে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম বুঝতেন এবং এই ইলম শিক্ষা করা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ‘ফরয’ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ‘নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল’ *(ফাত্বের ৩৫/২৮)*।

(২) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للآجل ‘ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হ’ল স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগৎ পরিহার করা।’ অন্যত্র বলেন, ‘ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের পর ইলম অর্জনের চেয়ে সর্বোত্তম আর কোন বিষয় নেই’।[৮]

(৩) ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন, الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ، ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلي دار الخلود ‘হিকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। আর বেশী বেশী মাসআলা জানার নাম ইলম নয়। এর একটি আলামত আছে। তা হচ্ছে ইলমের বদৌলতে প্রতারণার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে ধাবিত হওয়া’।

(৪) সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ‘ইলমের প্রথম ধাপ হ’ল চুপ থাকা। দ্বিতীয় ধাপ হ’ল মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং তা মুখস্ত রাখা। তৃতীয় ধাপ হ’ল ইলম অনুযায়ী আমল করা। চতুর্থ ধাপ হ’ল ইলম অন্যকে শিক্ষা দেয়া এবং তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা’।[৯] আর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا

---

২. *বায়হাক্বী, যুহদুল কাবীর ১/৩৫০, হা/৯৭৩; সনদে হিশাম বিন যিয়াদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।*
৩. *ছহীহুল জামি‘ হা/১৭২৭; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫৫।*
৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী-১, পৃঃ-১৩।*
৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১৪৭ পৃঃ।*
৬. *বুখারী হা/৭১, ৩১১৬ ও ৭৩১২; মুসলিম হা/১০৩৭।*
৭. *ছহীহুল জামি‘ হা/১৭২৭; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫৫।*
৮. *আল-মাদখাল লিল বায়হাক্বী, হা/৪৭৫।*
৯. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/৩৬২।*

رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সতর্ক হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

৩. সুশিক্ষাই জাতির মানদণ্ড :

একজন মানুষের শরীরের প্রধান অঙ্গ হ'ল মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা চলাফেরা করতে পারে না। আর অহির জ্ঞান হ'ল সকল জ্ঞানের মূল। তাই অহি ভিত্তিক দ্বীনী ইলম শিক্ষাকেই সুশিক্ষা বলা হয়। আর এই সুশিক্ষাকে মানবদেহের মেরুদণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়। কেননা মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন অক্ষম, অপদার্থ, তেমনই ইলমহীন মানুষ নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে মূর্খতার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দ্বীনী শিক্ষা মানুষকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হক-বাতিল প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক বুঝার ক্ষমতা দান করে, তেমনি ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ এনে দেয়। সুশিক্ষার অভাবে জাতি পদে পদে পিছিয়ে পড়তে থাকে। পশ্চাৎপদ জাতি পঙ্গু বা পরাশ্রয়ী হয়ে একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কোন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সেই জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করে দেয়াই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত অহিভিত্তিক শিক্ষাকে 'ইসলামী শিক্ষা' বলা হয়। যার ভিত্তি হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের উপরে। যার ফলে একজন ব্যক্তি উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, নির্লোভ, সৎ ও যোগ্য জনশক্তিতে পরিণত হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। সেগুলি হ'ল, ঈমান ও তা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ, বিশুদ্ধ ও বাতিল আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, হালাল-হারাম, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ'।[১০]

উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কল্যাণের পথ বহু রয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হ'ল শারঈ ইলম অর্জন করা।'[১১] আর এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সুশিক্ষা বা অহির জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয'।[১২] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, কোনো বিষয়ে কিছু বলা এবং আমল করার পূর্বে সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 'সুতরাং জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। 'জেনে রাখো' বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 'ইলম শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের' কথা বলেছেন।

১০. *আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ হা/১৬৩।*

১১. *শারহু রিয়াযুছ ছালেহীন ২/১৫০ পৃঃ।*

১২. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামি' হা/৩৯১৩; মিশকাত হা/২১৮।*

জীবন মানেই শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন উপায় নেই। যে শিক্ষাগ্রহণ করে না সে হয় মূর্খ নতুবা পাগল। সুশিক্ষার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য অপরিসীম। শিক্ষা দ্বারা বিদ্যা অর্জিত হয়। বিদ্যা জ্ঞানকে পরিপক্ক করে। আর জ্ঞান বিবেককে জাগ্রত রাখে এবং অর্জিত জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে পরিপুষ্ট হয় বিবেক। মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহর সর্বোত্তম নে'মত হ'ল বিবেক। আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*।

১৪০০ বছর পূর্বের সেই আইয়্যামে জাহিলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার থেকে উত্তরণ ঘটেছিল একমাত্র দ্বীনী ইলম তথা কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ও তাক্বওয়ার মজবুতির ফলে, যা আজও সারা পৃথিবীতে চিরন্তন ও সার্বজনীন। ইসলামের অনুশীলনের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহেলী যুগকে প্রগতিশীল স্বর্ণযুগে পরিণত করেছিলেন। সে যুগের মানুষই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কারণ তারা ইসলামের বিধি-বিধান তথা দ্বীনী ইলম অর্জন ও অনুসরণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। দ্বীনের অনুশাসনের ফলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল এবং সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، 'আমার যুগের মানুষই সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ, অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ'।[১৩] অর্থাৎ ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণকে এখানে সর্বোত্তম মানুষ বুঝানো হয়েছে।

ইলম তথা দ্বীনের বুঝের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. 'জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহভীতি অর্জন করে, তবে তাদের প্রতি আসমান-

১৩. *বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭।*

www.tawheederdak.com

যমীনের যাবতীয় বরকতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিব' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

জ্ঞানের মানদন্ডে প্রকৃত মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কারণ মানুষ যা শিখে তা-ই তার ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়ন করতে চায়। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশী উন্নত ও সফলতার শিখরে অবস্থানকারী। সুশিক্ষা মানুষের শৈশব থেকে পরিপক্কতার স্তর অবধি বিকাশের একটি পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

শিক্ষা যখন বিনিময়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়, তখন সে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ বিনিময় অর্জনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তা গ্রহণ করে। আর তা বাণিজ্যিক শিক্ষায় পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে যে শিক্ষা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে দেয়া ও নেয়া হয়, সে শিক্ষা সুশিক্ষায় রূপ নেয়। তাই বাধ্য হয়ে বলতে হয়, সুশিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

আবার ইলম অর্জন করলেই সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহভীতি অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বিবেক জাগ্রত হয়। তাই বলা হয়, 'বিবেক যেখানে উপস্থিত, সুখ সেখানে তিরোহিত। আর সুখ যেখানে উপস্থিত বিবেক সেখানে তিরোহিত'। সুতরাং সর্বদা বিবেকবান মানুষই জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। আর বৈষয়িক ও অহি-র জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত সুশিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত বিবেকবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে।

৪. জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রভাব :

প্রকৃত জ্ঞানই মানবজীবন ও সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান দিতে পারে। জ্ঞান চর্চা প্রতিটি মানুষকে অপার মহিমায় আলোকিত করে তোলে। সুতরাং জ্ঞান হ'ল নূর বা আলো। জ্ঞানহীন দেহ আঁধার ঘরের মতন বিদঘুটে। আলোকিত তারাই যারা ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল মুমিন। আর মুমিন হতে গেলে ইলম বা জ্ঞানার্জন অতীব যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে- 'আল্লাহ কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল মারফত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশকৃত শব্দ হল, اِقْـــرَأْ 'আপনি পড়ুন!। রাসূল (ছাঃ) তখন বলেছিলেন, 'আমি পড়তে জানি না'। তখন জিবরীল (আঃ) তাকে জাপটে ধরেছিলেন। এই একই দৃশ্য তিনবার হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সূরা 'আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়'।[১৪] আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَـــمْ يَعْلَمْ 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। ইলম আল্লাহর দেয়া মহান নেআমত, যা তিনি যাকে খুশী দান করেন। ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَـــبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّى لأَرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِى أَظْفَارِى، ثُـــمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. 'একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন স্বপ্নে দেখলাম আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হ'ল। আমি তা তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। এমনকি আমার মনে হ'ল যে, সে তৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম'। ছাহাবীগণ জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেন? জওয়াবে তিনি বলেন, الْعِلْمَ 'তা হ'ল ইলম বা জ্ঞান'।[১৫]

সুতরাং আমাদের সমাজ ও দেশ থেকে শিরক-বিদ'আত সহ সকল প্রকার যুলুম অত্যাচার দূর করতে ইলম অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) যেমন প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয করেছেন[১৬], তেমনি আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদের নিকটে অজানা বিষয় জেনে নিতে বলেছেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُـــونَ 'সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জান' *(নাহল ১৬/৪৩)*। মানুষেন দেহের রোগের চেয়ে আত্মার ব্যাধি অতীব মারাত্মক হয়। আর এর চিকিৎসা প্রকৃত জ্ঞানীদের নিকটে মিলে, যখন তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ 'নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হ'ল জিজ্ঞাসা'।[১৭] এজন্য জেনে-বুঝে সঠিকটা আমল করতে হয়, যাতে আত্মার প্রশান্তি অনুভব করে।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৪. বুখারী হা/৪৯৫৩।
১৫. বুখারী হা/৮২; ৭০০৬; তিরমিযী হা/২২৮৪; আহমাদ হা/৫৮৬৮।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।
১৭. আবু দাঊদ হা/৩৩৬; দারাকুৎনী হা/৭৪৪; ছহীহুল জামি' হা/৪৩৬২; হাসান ছহীহ ; মিশকাত হা/৫৩১;।

অনুবাদ গল্প

হালুয়া-রুটি

অনেক দিন আগে শীতকালের কোন একদিন জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি যোহরের ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যান। মসজিদের বারান্দায় খোলা আকাশের নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়ান যেন সূর্যের তাপে শরীর কিছুটা গরম হয়। সামনে বাজারের দোকানে কাজ করে এরকম চার শিশু বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিল।

তাদের একজন হালুয়া-রুটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন পনির-রুটি এবং চতুর্থ জন খালি রুটি খাচ্ছিল। যে শিশুটি পনির ও রুটি খাচ্ছিলো সে হালুয়া রুটি খেতে থাকা শিশুটিকে বললো : আমিও হালুয়া খেতে চাই, আমাকে একটু হালুয়া দাও।

হালুয়া খেতে থাকা শিশুটি বললো : তুমি আমার কুকুর হয়ে কুকুরের মত ডাকতে পারলে হালুয়া দিব। সে শিশুটি কুকুরের মত ডাকতে শুরু করল এবং একটু হালুয়া পেল। সেটা দেখে বাকিরা সবাই হাসাহাসি করল।

তৃতীয় জন বলল : আমিও একটু হালুয়া চাই। আমাকেও দাও।

সে বলল : যদি আমার গাধা হয়ে গাধার মত আওয়াজ করতে পার তাহলে দিব। সেও গাধার মত ডেকে একটু হালুয়া নিল।

চতুর্থ যে শিশুটি খালি রুটি খাচ্ছিল সে বলল : ওদের হালুয়া দিয়েছ এখন আমাকেও দাও।

শিশুটি বলল : আমার বিড়াল হয়ে মিঁউ মিঁউ শব্দ করলে দিব।

সে উত্তর দিল আমি কারো বিড়াল হব না। তোমার তো হালুয়া আছে আমাকে এমনিই দাও।

হালুয়া খাওয়া শিশুটি বলল : না। এটাই নিয়ম। হালুয়া পেতে হলে বিড়াল হও, নতুবা হালুয়া পাবে না।

শিশুটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল : দেখি আমি এই চাচাকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করব যে, হালুয়া খাওয়ার জন্য বিড়াল হওয়ার কোন দরকার আছে কিনা। তারপর মসজিদে থাকা ঐ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে শিশুটি জিজ্ঞাসা করল- চাচা, আপনি কী মনে করেন? হালুয়া খাওয়ার জন্য কি বিড়াল হব, নাকি হালুয়া না নিয়ে নিজের শুকনো রুটিই খাব।

তিনি উত্তর দেন, বাবা জানি না তোমাকে কী উত্তর দিব। তুমি ছোট মানুষ, তাই হালুয়া খেতে চাচ্ছ এবং তোমাদের কথাগুলোও আসলে মজা করার মত ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তাই কেবল এতটুকুই বলব যে, আমি গত ৩০ বছর ধরে দারিদ্রের কারণে কোনদিন হালুয়া খাইনি। তবুও দেখ, অন্যদের থেকে আমার কিন্তু কোন কিছুর কমতি নেই। মানুষ আমাকে অনেক সম্মান করে। আমার প্রতিবেশী আছে যারা প্রতিদিন হালুয়া খায়। অথচ তারা কারো কাছেই সম্মান পায় না।

শিশুটি আনন্দচিত্তে নির্ভার হয়ে বলল : তাহ'লে আমিও আমার শুকনো রুটিই খাব। হালুয়া চাই না। মানুষ ৩০ বছর হালুয়া না খেয়ে থাকতে পারলে ১০০ বছরও পারবে। তাহলে কেন নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কারো কুকুর হবে? কেন কারোর গাধা হবে? কেন কারোর বিড়াল হবে?

শিক্ষা : গল্পটি ঈষৎ হাস্যকর ও শিশুদের উদাহরণ প্রয়োগ করা হলেও তাতে সকলের জন্য গুঢ় শিক্ষা নিহিত রয়েছে। আর সেটা হ'ল, আমাদের সমাজের অনেক মানুষ সামান্য অর্থ, স্বার্থ কিংবা সামাজিক সুবিধার জন্য ধনিক শ্রেণী অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তোষামোদে ব্যস্ত থাকেন। এ কাজের দরুণ তাদের স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব যে অনেক নিচে নেমে যায়, সেদিকে তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করেন না। অপরদিকে অনেক সময় ধনিক শ্রেণী মানুষের অসহায়ত্বকে পুজি হিসাবে লাগিয়ে তাদেরকে সাহায্যের নামে সকলের কাছে নিজেকে হিরো সাজান এবং অন্যের সম্মান নষ্ট করে আনন্দ পান। এজন্য এ গল্প শিক্ষা দিচ্ছে যে, সামান্য কিছু খাবারের জন্য নিজের সম্মান না বিকিয়ে দিয়ে ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং নিজের আত্মমর্যাদবোধকে উচ্চকিত রাখা কর্তব্য *(গল্পটি ফারসী থেকে অনূদিত)*।

[অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আসমানী সাহায্য

-লতিফুল ইসলাম শিবলী, ঢাকা

এই জীবনে যে কয়বার অসহায় অবস্থায় সাহায্যের আশায় আসমানের দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য চেয়েছি, কোনবারই আমি নিরাশ হইনি। আমার উপন্যাস 'আসমান'-এর সামারীতে আমি লিখেছিলাম- 'চেনা সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, একটা অচেনা দরজা খুলে যায়'।

অবিশ্বাসীরা এই সব ঘটনাকে কাকতালীয় বললেও এসব আমার বিশ্বাসকে দিন কে দিন শক্তিশালী করেছে। আমি পাপ-পুণ্যে ভরা মানুষ, আমার প্রতি তাঁর অসীম দয়ার প্রকাশ আমাকে স্তব্ধ করে দেয়।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলি-

একবার গভীর রাতে আমার গাড়ি রাস্তার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। রাত তখন প্রায় ২টা বাজে। গাড়ির বনেট খুলে আমি আমার সাধ্যমত যা যা করার সব চেক করে হতাশ হয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে আছি। এখন আমার হাতে দুইটা অপশন, হয় গাড়িটা রাস্তার মধ্যে ফেলে চলে যেতে পারি অথবা বাকি রাতটুকু গাড়িতে বসে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

এসব ভাবছি আর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

ঠিক কিছু সময় পরেই একটা সাইকেল আরোহী এসে থামল আমার গাড়ির কাছে।

জিজ্ঞেস করল- কি হয়েছে?

উটকো লোক ভেবে আমি কোন পাত্তা দিলাম না।

গাড়ির বনেটটা উঠানো ছিল তাও বললাম, 'না ঠিক আছে কিছু হয় নি'।

লোকটা বলে- ভাই আমি ইঞ্জিন মিস্ত্রি, বলেন কি হইসে।

আমি সন্দেহ নিয়ে লোকটার দিকে ভালোভাবে লক্ষ করলাম। চেহারা-সুরত দেখে মনে হল অন্য কোন ধান্দা আছে বুঝি। তবুও তাকে বাজিয়ে দেখার জন্য বললাম- ঠিক আছে দেখ দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে চাবি নিয়ে দুই বার শেক্ষ মেরে বলল- প্লাগ বদলাইসেন কতদিন হল।

বল্লাম- অল্প কয়দিন হয়েছে।

সে বলল- ময়লা জমছে।

গাড়ির টুলবক্স নিয়ে ধুপধাপ করে প্লাগ খুলে পরিষ্কার করে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিল।

আমি অবাক বিস্ময় নিয়ে বললাম- 'ভাই তুমি কই থেকে আসলে?

সে বলল- 'আমার গ্যারেজ থ্যাইকা, এক স্যারের যরূরী কাজ ছিল, শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেছে।

আমি খুশি হয়ে তাকে একটা ৫শ' টাকার নোট এগিয়ে দিলাম। আলো-আধারীর মধ্যে আমার টাকার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে সে বলল- 'ভাই অনেক রাত হইসে বাড়ি যান', বলেই টাকা না নিয়ে হন হন করে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

আমার ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

জানি এসব ঘটনার অনেক জাগতিক ব্যাখ্যা আছে। আমি সে সব কেয়ার করি না। আমি জানি এসব সাহায্য কোথা থেকে আসে। তাই চেষ্টা করি নিজেকেও কারও সাহায্যে লাগাতে।

আপনি যখন কারও বিপদে এগিয়ে যাবেন তখন আপনি আর মানুষ থাকবেন না, পরিণত হবেন ফেরেশতায়।

কারন একজন অসহায়কে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্‌ আপনাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যেভাবে আল্লাহ্‌ যমীনে ফেরেশতা প্রেরণ করে থাকেন।

সুযোগ পেলে আল্লাহ্‌র দূত হওয়ার সেই সুযোগ কেউ ছেড়ে দিবেন না।

এই সব সাহায্য আপনার জীবনেই বার বার ফিরে ফিরে আসবে।

আমার আব্বা

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আব্বা বেরিয়ে গেলেন। নাতি-নাতনিকে দেখতে যাবেন। আমার ভাগ্নীটা বেশ চঞ্চল হয়েছে। সবাইকে সারাদিন ব্যস্ত রাখে। কল করলেই বলে, নানু তুমি কবে আসবে? তুমি এখন কী করছ? ইত্যাদি ইত্যাদি। আব্বা আবার নানান ঝামেলার মানুষ। কোথাও যেয়ে বেশিক্ষণ থাকেন না। আব্বা চেয়েছিলেন সকাল সকাল যেয়ে যোহরের আগেই ফিরে আসবেন। সেজন্যে খুব তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বের হলেন। ফিরেও এলেন যোহরের আগে, তবে লাশ হয়ে।

আনুমানিক সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে আব্বার এ্যাক্সিডেন্ট হয়। পেছন থেকে আসা ট্রলির ধাক্কায় সাইকেল আরোহী আব্বা গুরুতর আহত হন। উপযেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর যেলা হাসপাতালে নেয়ার পথে আনুমানিক পৌনে ১০টার সময় আব্বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এ্যাক্সিডেন্টের পর আব্বাকে যখন প্রথম দেখি তখন তিনি এ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সেই আটপৌরে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবীতে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে। কোনোরকমে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। এর তিন-চার মিনিট পর আব্বা মারা গেলেন।

ভালো মানুষ বাড়ি থেকে বের হলেন। হঠাৎ খবর এল এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এরপর তার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিনি মারা গেলেন। একটা মানুষ এত সহজে মরে যায়!

ছোটবেলায় আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এরপর যত বড় হয়েছি, সময় যেন এক অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি করেছে। শেষবার যখন তাকে জড়িয়ে ধরি, তখন তিনি লাশ হয়ে হাসপাতালের ট্রলিতে শুয়ে ছিলেন। যখন ঈষদুষ্ণ অশ্রুধারা তাকে সিক্ত করছিল, ততক্ষণে তিনি দূষিত দুনিয়ার মিছে মায়া কাটিয়ে ফেলেছেন। জানি এপারের কৃত্রিম ভালোবাসা ওপারে পৌঁছায় না। তবুও মনে হয় যদি আব্বাকে শেষ বারের মত কোনোকিছু বলার সুযোগ পেতাম, তাহ'লে বলতাম, আব্বা আপনাকে ভালোবাসি।

আমি জানি না, তবে অনেকে বলছিল গোসল করানোর পর নাকি আব্বার চেহারা থেকে এক ধরনের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। জানি না কারণ যতবার আব্বার সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

দু'কলম পড়ালেখা শিখে আব্বাকে বোকা, সাধাসিধে আর সহজ-সরল ভাবতে শুরু করেছিলাম। প্রায়ই বলতাম, মানুষ কি আর এত বোকা আছে আব্বা! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় কেউ! উপযাচক হয়ে অন্যের উপকার করার কোনো মানে হয় না! ইত্যাদি ইত্যাদি। বোকা আব্বা মৃত্যুর পর মানুষের যে দো'আ আর ভালোবাসা পেলেন তা দেখে রীতিমতো বুঝে গিয়েছি তার মতো বোকা হ'তে পারলে মানবজনম সার্থক।

সেই পুরনো সাইকেল, টেপ দিয়ে পেঁচানো মোবাইল ফোন, বুক পকেটে থাকা কলম, নোটবুক, নোটবুকে থাকা টাকা, চশমার খাপ, এমনকি মেয়ের বাড়ির জন্য কেনা আম, মিঠাই, খিচুড়ি- সবই ফিরে এল। ফিরলেন না শুধু আব্বা।

যখন একা একা থাকি, প্রায়ই একটা অনুভূতি ঘিরে ধরে। সব আছে, সব আছে, সব আছে; শুধু আব্বা নেই। নেই নেই নেই। 'আব্বা আর কখনো আসবেন না' ভাবতেই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রচুর সান্ত্বনা বাণীতে ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছি মৃত্যু জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু নয়। মৃত্যু জীবনেরই অংশবিশেষ। জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করতে হ'লে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। মৃত্যুকে বাদ দিয়ে জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়।

খুব কষ্ট হয় যখন ভাবি জীবনের শেষ মুহূর্তে আব্বা কী কষ্টটাই না পেয়েছেন। রক্তাক্ত দেহ পড়ে ছিল রাস্তায়। অন্তিম মুহূর্তে কোনো আপনজনকে কাছে পেলেন না। এসব ভাবলে মনটা ভারী হয়ে আসে।

'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয় *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

উপরের আয়াত মনে পড়ার পর থেকে ওসব মন খারাপ করা চিন্তা ছাপিয়ে নতুন চিন্তা জায়গা করে নিয়েছে। খেল তামাশার দুনিয়া থেকে আব্বা কীভাবে বিদায় নিলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আব্বা ক্বিয়ামতের দিন যেন সফল হন।

'যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদেরকে তাদের সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দেব। আর আমরা তাদের কর্মফল দানে আদৌ কমতি করব না। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ' *(তূর ৫২/২১)*।

এই আয়াত মনের মধ্যে আশা আর সাহস যোগাচ্ছে। আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ তো আছে! সুযোগটা কাজে লাগাতে পারব তো? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

[গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব মাষ্টার হাশিমুদ্দীন সরকার (৬৫) কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ২ পুত্র রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর নিজ গ্রাম কুমারখালীর নন্দলালপুর আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, নওদাপাড়া মারকাযের সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক হাফেয আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সংগঠন সংবাদ

বিভাগীয় যুবসমাবেশ

৭ই জুলাই ২০২১ ইং রোজ বুধবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাজশাহী বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক রাজশাহী বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। করোনার কারণে অনলাইনে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। নওগাঁ যেলা সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জয়পুরহাট যেলা সভাপতি নাজমুল হক। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী সদস্য মীযানুর রহমান।

১২ই জুলাই ২০২১ ইং রোজ সোমবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ময়মনসিংহ বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক ময়মনসিংহ বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী, বর্তমান সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ।

১৬ই জুলাই ২০২১ ইং রোজ শুক্রবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঢাকা বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক ঢাকা বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. কাবীরুল ইসলাম, আহলেহাদীছ জাতীয় ইমাম ও ওলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ-এর ঢাকা উত্তর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস।

২২শে জুলাই ২০২১ ইং রোজ বৃহঃবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ চট্টগ্রাম বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ অলীউল্লাহ।

২৩শে জুলাই ২০২১ ইং রোজ শুক্রবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বরিশাল বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক বরিশাল বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমুদ ইমরান।

২৬শে জুলাই ২০২১ ইং রোজ সোমবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ সিলেট বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক সিলেট বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ সিলেট যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম আযম।

২৯শে জুলাই ২০২১ ইং রোজ বৃহঃবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রংপুর বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক রংপুর বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন রংপুর বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ রংপুর যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মতিউর রহমান।

৩০শে জুলাই ২০২১ ইং রোজ শুক্রবার : অদ্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ খুলনা বিভাগীয় যেলাসমূহ কর্তৃক খুলনা বিভাগীয় যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শেখ রফীকুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন খুলনা বিভাগের বিভিন্ন যেলার প্রতিনিধিগণ। উক্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ সাতক্ষীরা যেলা সাধারণ সম্পাদক ছফীউল্লাহ।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : মধ্যপ্রাচ্যের মূল অধিবাসী কারা?
উত্তর : আরব জাতি।

২. প্রশ্ন : আরবরা মূলত কতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত?
উত্তর : ৩টি। ক. আদি আরব। খ. ক্বাহতানী আরব গ. আদনানী আরব।

৩. প্রশ্ন : আরবের ভৌগলিক অবস্থান কোথায়?
উত্তর : তিনদিকে সাগর বেষ্টিত অর্থাৎ পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর (যা ভারত মহাসাগরেরর বিস্তৃত অংশ) এবং উত্তরে সিরিয়া ও ইরাকের ভূখণ্ড। যার আয়তন প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গমাইল।

৪. প্রশ্ন : ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল কী?
উত্তর : ইস্রাঈল।

৫. 'ইস্রাঈল' (إسرائيل) শব্দের অর্থ কি?
উত্তর : আল্লাহ্র দাস।

৬. প্রশ্ন : কোন বংশে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে।

৭. প্রশ্ন : জাহেলী যুগে তাওয়াফের কোন পোষাক পরতে হত?
উত্তর : হারামের পোষাক (ثياب الحرم) নামে নতুন পোষাক।

৮. প্রশ্ন : জাহেলী যুগে কা'বাগৃহে কি ধরনের মন্দ ইবাদত হত?
উত্তর : শিস দেওয়া ও তালি বাজানো *(আনফাল ৮/৩৫)*।

৯. জাহেলী যুগে মু'আল্লাকা খ্যাত তাওহীদের আক্বীদা পোষণকারী কবির নাম কি?
উত্তর : যুহায়ের বিন আবী সালমা ও কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ।

১০. প্রশ্ন : চারটি সম্মানিত মাসে নাম কী?
উত্তর : যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব

১১. প্রশ্ন : কার খেলাফতকালে প্রথম সিরিয়া থেকে মদীনায় গম রফতানী হয়।
উত্তর : মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে।

১২. কুরায়েশদের কোন গোত্রনেতাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল?
উত্তর : হাশেম বিন আব্দে মানাফ গোত্রনেতাদের সাথে।

১৩. কুরায়েশরা শীত ও গ্রীষ্মকালে কোথায় ব্যবসায়িক সফর করত?
উত্তর : শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে শামে।

১৪. প্রশ্ন : জাহেলী যুগে মক্কা-মদীনায় কিসের আবাদ ছিল না?
উত্তর : গমের আবাদ।

১৫. প্রশ্ন : আরবদের মধ্যে কয় ধরনের বিবাহ চালু ছিল?
উত্তর : চার ধরনের।

১৬. প্রশ্ন : মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নে'মত কী?
উত্তর: কুরআন ও সুন্নাহ।

১৭. প্রশ্ন : জান্নাতের ভাষা কী?
উত্তর: আরবী।

১৮. প্রশ্ন : মক্কায় প্রথম অধিবাসী ছিলেন কে?
উত্তর : মা হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল।

১৯. প্রশ্ন : কা'বাগৃহ কার হাতে নির্মিত হয়?
উত্তর: ইবরাহীম ও ইসমাঈলের।

২০. ইসমাঈল (আঃ) আজীবন কি ছিলেন?
উত্তর : আজীবন স্বীয় বংশের নবী ও শাসক ছিলেন।

২১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ২১তম উর্ধ্বতম পুরুষের নাম কি?
উত্তর : আদনান।

২২. প্রশ্ন : কাকে পৃথিবীর নাভিস্থল (وَسَطُ الْأَرْضِ) বলা হয়?
উত্তর : মক্কাকে ।

২৩. কুরআনে মক্কা নগরীকে কি নামে অবহিত করা হয়েছে?
উত্তর : أُمُّ الْقُرَى বা আদি জনপদ।

২৪. প্রশ্ন : মক্কা (مكة) শব্দের অর্থ কি?
উত্তর : ধ্বংসকারী।

২৫. প্রশ্ন : মক্কা এর অপর নাম কি?
উত্তর : বাক্কা (بَكَّةُ)।

২৬. প্রশ্ন : জাহেলী যুগে ইয়ামনের খৃষ্টান গভর্ণরের নাম কি?
উত্তর : আবরাহা।

২৭. প্রশ্ন : মক্কার পূর্ব দিকের পাহাড়ের নাম কি?
উত্তর: আবু কুবাইস।

২৮. প্রশ্ন : মক্কার পশ্চিম দিকের পাহাড়ের নাম কি?
উত্তর : কু'আইক্বা'আন।

২৯. প্রশ্ন : নাদওয়া (النَّدْوَةُ) শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: পরামর্শ সভা।

৩০. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালে মক্কার নেতা ছিলেন কে?
উত্তর : তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন হাশেম এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ছিলেন চাচা আবু ত্বালেব।

৩১. প্রশ্ন : মক্কার প্রধান আকর্ষণ হ'ল কী?
উত্তর: যমযম কূয়া ও কা'বাগৃহ।

৩২. প্রশ্ন : শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মের কতদিন পূর্বে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে?
উত্তর : মাত্র ৫০ বা ৫৫ দিন।

৩৩. প্রশ্ন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বাগৃহের ভিতরে ও চারপাশে কতটি মূর্তি দেখতে পান?
উত্তর : ৩৬০টি।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান কে?
উত্তর : এস এম শফিউদ্দীন আহমেদ।
২. প্রশ্ন : বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান কে?
উত্তর : শেখ আব্দুল হান্নান।
৩. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে ভৌগলিক নির্দেশক (GI) পণ্য কতটি?
উত্তর : ৯টি।
৪. প্রশ্ন : ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের পরিমাণ কত?
উত্তর : ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা।
৫. প্রশ্ন : ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সাধারণ করমুক্ত আয়সীমা কত?
উত্তর : ৩ লাখ টাকা।
৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশে দরিদ্র জনসংখ্যার হার কত?
উত্তর : ২০.৫%।
৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশে অতি দরিদ্র জনসংখ্যার হার কত?
উত্তর : ১০.৫%।
৮. প্রশ্ন : বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার কত?
উত্তর : ৭৪.৭%।
৯. প্রশ্ন : ২০২১ জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১০৯তম।
১০. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কতটি?
উত্তর : ৭টি।
১১. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৩,২২২টি।
১২. প্রশ্ন : বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ পর্যন্ত কয়টি করোনা টিকার যরূরী ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেন?
উত্তর : ৬টি।
১৩. প্রশ্ন : ১৫ই জুন ২০২১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কোন টিকার যরূরী ব্যবহারের অনুমোদন দেন?
উত্তর : জনসনের এক ডোজের টিকা।
১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মোট জিডিপির পরিমাণ কত?
উত্তর : ৩৪,৫৬,০৪০ কোটি টাকা।
১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় কত?
উত্তর : ২,৪৬২ মার্কিন ডলার।
১৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৫টি।
১৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৫০টি।
১৮. প্রশ্ন : ২০২১ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১৫২ তম।
১৯. প্রশ্ন : জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাংলাদেশী প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : শাহরিয়ার আহমেদ।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : নাফতালি বেনেত।
২. প্রশ্ন : ইসরায়েলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : আইজ্যাক হারজোগ।
৩. প্রশ্ন : ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর নামকরণ করে কোন দেশ?
উত্তর : ওমান।
৪. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে বিটকয়েনকে বৈধ-মুদ্রা বা কারেন্সি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ?
উত্তর : এল সালভাদর।
৫. প্রশ্ন : প্রথম মুসলিম ব্যক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল বিচারক পদে নিয়োগ পান কে?
উত্তর : জাহিদ নিসার কুরাশি।
৬. প্রশ্ন : অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তর : ম্যাথিয়াস হুবার্ট পল করম্যান (অস্ট্রেলিয়া।
৭. প্রশ্ন : অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ৩৮টি।
৮. প্রশ্ন : ২৫শে মে ২০২১ কোন দেশ 'OECD' ৩৮তম সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : কোস্টারিকা।
৯. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থার (IRENA) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১৬৪টি।
১০. প্রশ্ন : ১৪ই মে ২০২১ কোন দেশ IRENA'-এর ১৬৪তম সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : কিরগিজিস্তান।
১১. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক অভিবাসন জ্বালানি সংস্থার (IOM) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১৭৪টি।
১২. প্রশ্ন : গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১৩. প্রশ্ন : গম আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : মিসর।
১৪. প্রশ্ন : ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১৫. প্রশ্ন : ভুট্টা আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১৬. প্রশ্ন : ভুট্টা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১৭. প্রশ্ন : চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।
উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে বই, পত্রিকা, দেওয়ালপত্র, পোস্টার, লিফলেট, কার্ড, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে ও নিখুঁতভাবে ছাপানো হয়। এছাড়া অটো মেশিনের মাধ্যমে নিজস্ব বাইণ্ডিং কারখানায় রুচিসম্মতভাবে বাঁধাই করা হয়।

বিঃদ্রঃ : এখানে প্রাণীর ছবি সংবলিত এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল বিরোধী কোন কিছু ছাপানো হয় না।

যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭৫৮-৫৩৫৫৪৯

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রয়োজনীয় ৪টি প্রকাশনা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ই-মেইল : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com, ওয়েব : www.juboshongho.org

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak জুলাই-আগস্ট ২০২১ মূল্য : ২৫ টাকা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন এ্যাপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার

এ্যাপে যা সংযুক্ত করা হয়েছে

- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ
- প্রতি মাসের আত-তাহরীক (পুরাতন সংখ্যা সহ)
- বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল (৩০০০+)
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অন্যান্য আলেমদের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য (১৫০০+)
- তাবলীগী ইজতেমা, জুম'আর খুৎবা ও ইসলামী সম্মেলনের বক্তব্য সমূহ
- আত-তাহরীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানসমূহ
- আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর জাগরণীসমূহ

Hadeeth Foundation

GET IT ON Google Play

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

ইয়াতীমখানা ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য দেশ-বিদেশের দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

১. পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

২. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড
হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

৩. বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

নির্মাণাধীন ইয়াতীমখানা ভবন

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪